গীতা-পরিচয়

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।"

*　*　*　*　*

শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম্ এ
প্রণীত।

কলিকাতা, ৩।১ রাজার লেন হইতে
শ্রীদেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১১৪নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, "নববিভাকর যন্ত্রে"
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

বৈশাখ—১৩১২।

শ্রীশ্রীগুরুঃ

নিবেদন।

"গীতা-পরিচয়" স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু ইহা গ্রন্থকারের সম্পাদিত (যন্ত্রস্থ) সমগ্র "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার" অংশ মাত্র।

গ্রন্থকার নিজ ধর্ম্ম-জীবনের উৎকর্ষ বিধান-কল্পে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতার মহাজন-প্রদর্শিত যে সুপ্রশস্ত রাজপথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং অনুভূত বিষয়গুলি দৃঢ় করিবার জন্য যে যে তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—গীতা পূর্ব্বাধ্যায়রূপে গীতা উপদিষ্ট হইবার স্থান, কাল, পাত্র অবলম্বনে প্রাচীন সামাজিক ছবি ও আর্য্য জাতির আদর্শ-শিক্ষা, গীতা উত্তরাধ্যায়রূপে গীতোক্ত শব্দ সমূহের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহাভারতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে ধর্ম্ম-জীবন গঠনোপযোগী অনুষ্ঠান সমূহের বিশদ বিবরণ, গীতার পাঠক্রম, অধ্যায়-নির্ঘণ্ট, মূল, অন্বয়, প্রধান প্রধান ভাষ্য অবলম্বনে সহজ সংস্কৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের সংশয়-নিরাস, এক অধ্যায়ের সহিত অপর অধ্যায়ের সম্বন্ধ নির্ণয়, বর্ণমালা ক্রমে শ্লোক-নির্ঘণ্ট, ভগবান্ শঙ্কর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ, রামানুজ ও শ্রীধরস্বামিকৃত সমগ্র পাঁচটী টীকা প্রভৃতি যাহা যাহা বহু বৎসর ধরিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন—গ্রন্থকারের সেই হৃদয়-রত্নগুলি আমরা "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম- "গীতা-পরিচয়" তাহারই অংশ মাত্র। ইতি—

প্রকাশক।

সূচী পত্র।

অশুদ্ধ সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মনসে	মনসো	৩	২৮
শান্তি	শান্তিঃ	ঐ	৩০
নিঃশ্রেয়স্	নিঃশ্রেয়স	৫	১২
তস্মাদ্দমুত্তিষ্ঠ	তস্মাৎত্বমুত্তিষ্ঠ	৭	৮
শ্রীমভাগবদ্গীতায়	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়	ঐ	১২
ভগবান	ভগবান্	৮	২২
নিগুণ	নির্গুণ	১১	১৪
অন্তর্য্যামীরূপে	অন্তর্যামিরূপে	ঐ	১৭
বিগলিত করা, নিষ্কাম কর্ম্ম—	বিগলিত করা নিষ্কাম কর্ম্ম,	১৩	
তমো ও সত্ত্ব—গুণের	তমঃ ও সত্ত্বগুণের	১৪	১৯
"লয়	লয়	১৫	৩
রিপুকর্ত্তৃক	রিপু দ্বারা	ঐ	২৯
বলেন।	বলেন—	১৬	১৯
মৌর্খ্যা	মৌর্খ্যাদ্	ঐ	২৫
ভবেদ্	ভবেজ্	১৭	২০
সুনিশ্চতম্	সুনিশ্চিতম্	১৮	২৪
জ্ঞনং	জ্ঞানং	২১	১
কল্পকোটে	কল্পকোটি	ঐ	১২
সমীপ্য	সামীপ্য	ঐ	২৪
আত্মভিমান	আত্মাভিমান	২২	২৩
নচান্যোস্মিণ	নচান্যোঽস্মি	২৩	১১
বহুশ্রুতোবা	বহুশ্রুতোবা।	২৫	১২
সম্পূর্ন—	সম্পূর্ণা	ঐ	১৩
"উত্তিষ্ঠ"	"উত্তিষ্ঠত"	২৬	১
মোহগ্রস্থ	মোহগ্রস্ত	ঐ	২৬
মোহগ্রস্থের	মোহগ্রস্তের	২৭	৭
শ্রীভগবান্,	শ্রীভগবান্	ঐ	১৬
নিত্যস্তোক্তা	নিত্যস্তোক্তাঃ	২৮	১২
সংন্যাস্যা	সংন্যস্যা	২৯	১৮
মাচ্চিত্তো	মচ্চিত্তো	ঐ	২৬
তস্মাদ	তস্মাদ্	৩০	১
ভুঙ্ক্ষ্বা	ভুঙ্ক্ষ্ব	ঐ	১৪
অর্জ্জুন	অর্জ্জন	৩৪	১৮
চাপচাহ্নিকম	চাপরাহ্নিকম	ঐ	২৮
যাবদশুভং	যাবদশুভম্	৩৫	৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কর্ম্ম, চেষ্টা দ্বারা	কর্ম্ম ও চেষ্টা দ্বারা	৩৯	২০
স্বতশ্চেতি	স্বতশ্চেতি	,,	২৫
সমান্তর	সমন্বয়	৪০	২২
রাখিয়া	রাখিয়াও	৪৪	১০
প্রযত্নস্যাসাধ্য	প্রযত্নস্যাসাধ্যং	৪৫	৩
মাণ্ডুক্য	মাণ্ডূক্য	৪৮	২৯
সিদ্ধাবসিদ্ধৌ	সিদ্ধ্যবসিদ্ধ্যৌ	৫৫	১৪
লব্ধা	লব্ধ্বা	,,	২৭
গুরুনাপি	গুরুণাঽপি	,,	২৮
যোগীনা	যোগিনা	৫৬	৭
মদ্গাতে নান্তরাত্মন্	মদ্গতে নান্তরাত্মনা	,,	৮
ভগবান	ভগবান্	,,	১৩
নিরহংঙ্কারঃ সমদুঃখসুখ	নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ	,,	২২
যাতত্মা	যতাত্মা	ঐ	২৪
মর্য্যর্পিত	মর্য্যর্পিত	ঐ	২৫
মধেই	মধ্যেই	৬১	২১
কৰ্ম্ম	কর্ম্ম	৬২	১৩, ১৫, ১৬, ১৭
ধৰ্ম্ম	ধৰ্ম্ম	,,	২০
কর্ম্মেও	কর্ম্মেরও	,,	২২
উভয়	উভয়ই	৬৩	২৩
ভূমিকার	ভূমিকায়	৬৯	২৯
তাঁহাদিকে	তাঁহাদিগকে	৭০	৫
অভাস	অভ্যাস	৭২	২
কথন	কথন্	,,	২০, ২১, ২২
গুণাতাত	গুণাতীত	৮১	২১

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ

তৎ সৎ

—০০৯৯০০—

শ্রীগণেশায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

সদ্‌গুরু আনন্দ-ব্রহ্ম। আমি জীব, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি। তুমি পরম সুখ-স্বরূপ, জীবকে প্রকৃত আনন্দ দানে তুমিই সমর্থ। তুমি কেবল। কেবল আনন্দ ভিন্ন তোমাতে আর কিছুই নাই। জ্ঞান-মূর্ত্তি তুমি,—সুষুপ্তির অজ্ঞানানন্দ তুমি নও, তুমি সজ্ঞানানন্দ। শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব তোমাতে নাই। তুমি গগন-সদৃশ সীমাশূন্য। শ্রুতি, 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্যে তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। তুমি এক— 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। 'এক' বলিয়া তুমি স্বগত-ভেদ শূন্য, 'এব' বলিয়া তুমি স্বজাতীয়-ভেদ হীন, এবং 'অদ্বিতীয়' বলিয়া তুমি বিজাতীয়-ভেদ বর্জ্জিত। নিত্যবস্তু তুমিই,—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে একমাত্র তুমিই আছ,—যাহা সর্ব্বকালে থাকে না তাহা অনিত্য। তুমি নিতান্ত নির্ম্মল—অজ্ঞান-মল তোমাতে নাই। তুমি সর্ব্বদা অন্তরের ও বাহিরের সকল চেষ্টার, সকল কার্য্যের দ্রষ্টা—সর্ব্ববিষয়ের সাক্ষী তুমি। তুমি ভাবাতীত ও গুণাতীত।

স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

যে ব্রহ্ম হইতে আনন্দকণা আকাশে ও ভূমিতলে স্ফুরিত হইতেছে, সর্ব্ব জীবের জীবন, সেই আনন্দ-ব্রহ্মকে নমস্কার।

তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদৌ শীর্ষো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসোজাত শ্চক্ষুঃ সূর্য্যস্তব প্রভো॥
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং, স্তোতাস্তুতিঃস্তব্য ইহ ত্বমেব।
ঈশ! ত্বয়াবাস্যমিদং হি সর্ব্বং, নমোঽস্তুভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

উৎসর্গ

ওঙ্কারপিঞ্জর শুকী মুপনিষদুদ্যানকেলীকলকণ্ঠীম্।
আগম বিপিন ময়ূরীং আর্য্যামন্তর্বিভাবয়ে গৌরীম্॥
ব্রহ্মস্বরূপাং পরমাং রাম-রামাং মনোরমাম্।
নির্লিপ্তাং নির্গুণাং নিত্যাং সত্যাং শুদ্ধসনাতনীম্॥

ওঙ্কার-পিঞ্জরে তুমি শুক-পক্ষিণী,—উপনিষদ্-উদ্যানে তুমি কেলী-কলকণ্ঠী, আগম-বিপিনে তুমি ময়ূরী,—তুমি আর্য্যা,—তুমি গৌরী, আমি মানসে তোমার ভাবনা করি। তুমি ব্রহ্মস্বরূপা, নির্লিপ্তা, নির্গুণা, নিত্যা, শুদ্ধসনাতনী। তুমি মনোরমা—তুমি রাম-রামা—এ আয়োজন তোমার জন্য। তুমি সর্ব্ববেদে প্রণব, তুমি ওঙ্কার-বীজাক্ষরী, তুমি মহাবাশিষ্ঠ-রামায়ণে রাম-বশিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন তুমিই। শ্রীঅর্দ্ধনারীশ্বর তোমার সচ্চিদানন্দগঠিত মূর্ত্তি—রাজগুহ্য ব্রহ্ম-বিদ্যা তোমার স্বরূপাভাস—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-ক্রিয়া তোমার তটস্থ-ভ্রূভঙ্গী,—বাক্য তোমার রূপগুণ প্রকাশে অসমর্থ! লীলা তোমার অনন্ত! তুমি সর্ব্বদেবদেবী অলঙ্কৃত—কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি ভাবে তুমি সর্ব্বত্র প্রপূজিত। তুমি মায়ামানুষ—তুমি মায়ামানুষী। গীতাবস্ত্রান্তর্ব্যাপ্তিত উপনিষদ্দেবী তুমিই—চন্দ্রার্কাগ্নি-সমানকুণ্ডলধরী গায়ত্রীদেবী তুমিই।

হে গুরো! হে মহাদেব-আলিঙ্গিত মহাদেবি! হে সর্ব্বনরনারী-বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তে! এই চিরপ্রফুল্ল কুসুম-স্তবক তুমিই—উৎসর্গও তোমাকেই করা হইল।

তোমায় ভুলিয়া মানবের তৃপ্তির জন্য যেন আমার কোন অনুষ্ঠান না হয়। কায়মনোবাক্যোত্থিত আমার ভূমি-বিলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম যেন তোমার বিশ্বরূপ-ঘনীভূত শ্রীমূর্ত্তি-চরণে নিরন্তর লগ্ন থাকে। তোমার তৃপ্তির জন্য সমস্ত লৌকিক-কর্ম্ম অবসানে তোমার 'সর্ব্বজীবে নারায়ণ-অনুভূতি'-রূপ উপাসনা শেষে যেন আমি তোমায় জানিয়া তোমার সঙ্গে নিরন্তর ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারি।

আর যোগভক্তিজ্ঞানের কণ্ঠমালা ধারণ করিয়া তোমার জগৎ যেন তোমার চরণতলে চির-বিশ্রান্তি লাভ করে। অলমতি বিস্তরেণ।

নমস্কারো হ্যষ্টাঙ্গঃ সকল দুরিত ধ্বংসন পটুঃ,
কৃতং নৃত্যং গীতং স্তুতিরপিরমাকান্ত ত ইয়ম্।
তব প্রীত্যৈ ভূয়াদহমপি চ দাস স্তববিভো,
কৃতং ছিদ্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেঽস্তভগবন্॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসে মনোযদ্বাচোহবাচঃ সউপ্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষ
শ্চক্ষুঃ অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি।
ওঁ হরিঃ ওঁ।

আমিই জীবকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি, আমিই ক্রূরকে আসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করি, আমিই দিব্য চক্ষু প্রদান করি, আমিই দুরাচারকে সাধু করি। কোথাও ব্রহ্ম-ভাবে বলিতেছেন, "নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" কোথাও ঈশ্বর-ভাবে বলিতেছেন "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। কোথাও বলিতেছেন "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া" (আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়া বশতঃ প্রকাশিত হই)। আবার কোথাও বলিতেছেন "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং-মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" ৭।৪-৫। ইত্যাদি।

দেহ-শূন্য আত্মা কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন? সেইরূপ উপাধি-শূন্য ব্রহ্মের তত্ত্ব কে প্রকাশ করিবে? নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সংবাদ যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় "যন্নবেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্। ন যত্রবাক্ প্রভবতি" এই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে বেদ জানেন না, মন ইঁহার বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে, বাক্যের সাধ্য কি সে পর্য্যন্ত উঠিতে পারে! তিনি অবাঙ্মনস-গোচর—অচিন্ত্য—অব্যক্ত—নির্গুণ! যিনি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে অধিক বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্র-জালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্। সচ্চিৎসুখৈকাপরমাত্মরূপা, সাকাশিকাহং নিজ বোধরূপা" তিনি 'নিজ বোধ-রূপ'—এই পর্য্যন্ত ইঁহাদের উক্তি। ইনি দ্রষ্টা, ইঁহাতে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ত্রসরেণুবৎ উঠিতেছে, লয় পাইতেছে। ইনি সর্ব্বসাক্ষী—ইনি অন্তর্য্যামী, এরূপ উক্তিও আছে। নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্ম হইতে জগৎ-ইন্দ্রজাল উৎপন্ন হইতেছে, জীব আপন আপন কর্ম্মফলে ঊর্দ্ধাধঃ গতি লাভ করিতেছে—ইহা যে গীতা বলেন নাই, তাহা নহে। "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তুপ্রবর্ত্ততে॥" প্রভু লোকের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা ফল সংযোগ সৃষ্টি করেন না, স্বভাবই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, গীতা এ সংবাদ দিতেছেন, কিন্তু সবিশেষ-ব্রহ্ম আত্মমায়ায় ঈশ্বরভাব ধারণ করিয়া নাম রূপ গ্রহণ করিয়া আপন তত্ত্ব, আপন জন্ম, আপন কর্ম্ম, আপনি বুঝাইতেছেন, তাঁহার আশ্রিত জীবকে আশা দিতেছেন "অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ"। বলিতেছেন, তুমি আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। বলিতেছেন, তুমি যদি নিতান্ত দুরাচারও হও, তথাপি আমাকে ডাকিবার শক্তি তোমার আছে, তুমি অনন্যভাক্ হইয়া আমাকে ডাক', সাধু হইয়া যাইবে।

সংসার-চেষ্টা, পরিজন-পোষণ যদি তোমায় আমার কর্ম্মে বাধা দেয়, মনে ভাব', আমায় বিশ্বাস কর', সর্ব্বচিন্তা ত্যাগ করিয়া আমাকেই ডাকিতে থাক', আমিই তোমার যোগক্ষেম বহন করিয়া আনিব। আমিই তোমার অর্জ্জন-রক্ষণের ভার লইয়াছি, তুমি আমায় নিশ্চিন্ত হইয়া ভজনা করিতে থাক'। ভগবানের এই আশ্বাস-বাণী আর কোথায় এত প্রবল-ভাবে জীব-হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়াছে? আর কোথায় এত প্রবল ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়, "মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে," আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়, তুমি সত্যই আমাকে পাইবে? কোথায় শোনা যায়, "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"? এই সবিশেষ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বচিত্তগামী সগুণ ব্রহ্মের আপন মুখে আপন মূর্ত্তিগ্রহণ, আপন মুখে জীবকে উৎসাহ-প্রদান, আর কোথায় এরূপ ভাবে শুনিতে পাই? শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। আসুরী-রাক্ষসীযোনির মনুষ্য হউক, কাহাকেও হতাশ করিতেছেন না। যদি সমুদয় পাপকারী হইতেও তুমি পাপী হও "অপিচেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ" তথাপি ভগবান্ তোমায় আশ্বাসিতেছেন! তুমি স্ত্রীলোক হও, বৈশ্য হও, শূদ্র হও, ভগবান্ তোমাকেও হতাশ করেন নাই—বলিতেছেন "তেঽপি যান্তিপরাং-গতিম্।" পাপীতাপীর এমন বন্ধুর কথা, কাঙ্গালের এমন ঠাকুরের কথা, এমন ভাবে আর কোথায় শুনিতে পাওয়া যায়? যিনি এক দিকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইয়া ভক্তের ভীতি উৎপাদন করিতেছেন, তিনিই আবার অন্য দিকে সখারূপে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন "দেখ, আমি তোমারই আছি, তুমি আমার বড় প্রিয়, তুমি-শূন্য জগতে আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না।" অভিমন্যু বিনাশের পর ভগবান্ দারুককে বলিতেছেন "অনর্জ্জুনমিমং লোকং মুহূর্ত্তমপিদারুক। উদীক্ষিতুংনশক্তোঽহং ভবিতা নচতৎতথা॥ যস্তং দ্বেষ্টি সমাং দ্বেষ্টি যস্তং হন্তুংসমামনু। ইতি সঙ্কল্প্যতাং বুদ্ধ্যা শরীরার্দ্ধং মমার্জ্জুনঃ॥" আবার এই মায়ামানুষই বলিতেছেন "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥" তাই আমরা বলিতেছিলাম, অন্যান্য সংবাদ বাদ দিলেও এই আশ্বাস-বাণীই গীতার বিশেষত্ব। আমরা গীতার কতকগুলি আশ্বাস-বাণী একত্র করিলাম, ইহা নিত্য-সেব্য :—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥ ১৮।৬৬

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজীমাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসিমে॥ ১৮।৬৫

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যে নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥ ১২।৬-৭

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্॥ ১১।৮

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহম্॥ ৯।২২

তেষাংসতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥ ১০।১০

তেষামেবানুকম্পার্থ মহ মজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মা মনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না, কিন্তু এমন মধুর বাণী আর কোথায়? যেখানে ভগবান বলিতেছেন,—"আমাকে যাহা দাও তাহাই আমি ভোজন করিয়া থাকি; কিন্তু যাহা দিবে, ভক্তি-পূর্ব্বক প্রদান করিও।" ভক্তি করিবার সামর্থ্য পাপী, তাপী, সুদুরাচারী সকলেরই আছে, যদি সুদুরাচারও ভক্ত হইতে না পারিত, তবে কি ভগবান্ বলিতেন, "অপিচেৎ সুদুরাচারোভজতেমা-মনন্যভাক্"? সুদুরাচার হইয়াও একান্ত চিত্তে যদি কেহ আমাকে ডাকে ইত্যাদি,

ইহাতেই বুঝিতে হইবে, সুদুরাচার হইলেও একাগ্রচিত্তে ডাকিবার সামর্থ্য থাকে। নরের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল নারায়ণের আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া কাহার না সাধ হয় তাঁহাকে পূজা করি? নারায়ণ যে বলেন,

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ। ৯৷২৬।

"আমাদের কাতরোক্তি, আমাদের কাতর প্রার্থনা, তিনি কি শুনিয়া থাকেন?"—এই-না অবিশ্বাসীর সন্দেহ? "আমি ভিখারী, তিনি সর্ব্বেশ্বর, আমার পূজা তিনি কি গ্রহণ করিবেন?"—এই-না দুর্ব্বল-বিশ্বাসীর সংশয়? বিশ্বাসের কর্ণে ভগবানের আশ্বাস-বাণী শুনিলে সন্দেহ বা সংশয় কি আর থাকে? আরও কত আশ্বাস-বাণী আছে। ভক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহাকে ডাকিতে থাকিলে তিনি সংসার যাত্রাও নির্ব্বাহ করিয়া দিয়া থাকেন, মোক্ষও দিয়া থাকেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভক্ত যে অন্য কর্ম্ম চেষ্টা করিবে, ইহা ত তিনি সহ্য করিতে পারেন না, তাই বলেন :—

"অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

ভক্তের জন্য তিনি আপনিই যোগ ও ক্ষেম বহন করেন। যদি এখনও ভক্ত হইতে না পারিয়া থাক, যদি এখনও 'আমার কর্ম্ম' 'আমার কর্ম্ম' বলিয়া অভিমান আছে বুঝিতে পার, এ অবস্থায় তিনি তোমার যোগক্ষেম বহন করেন না সত্য, এই কর্ত্তৃত্বাভিমানীদিগকে তিনি বলিতেছেন—"তোমার যতদিন 'অহং কর্ত্তা' বোধ আছে, তোমার যতদিন 'আমার কর্ম্ম' বোধ আছে, ততদিন তুমি তোমার সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর, আমার প্রীতি জন্য কর্ম্ম করিতেছ স্মরণ করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে থাক, 'যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।' আহার ভ্রমণাদি লৌকিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি বৈদিক কর্ম্ম যাহা যাহা 'তোমার কর্ম্ম' বলিয়া অভিমান করিতেছ, তাহাই আমাতে অর্পণ কর। কর্ম্ম করিবার আদিতেই মনে মনে জিজ্ঞাসা কর—'আমার এই কর্ম্মে তুমি কি প্রসন্ন হইবে?' ইহা বলিলে বিহিত-কর্ম্ম ভিন্ন নিষিদ্ধ-কর্ম্ম তুমি আর করিতেই পারিবে না। তখন আমি তোমায় একান্তে মৎকর্ম্মের ভার প্রদান করিব, আমার সেবায় অধিকার দিব। সে অবস্থায় তোমার আহারের চেষ্টাও করিতে হইবে না, যোগক্ষেম আমিই বহন করিয়া আনিয়া দিব।"—এমন আর কোথায় শুনিতে পাওয়া যায়?

আশ্বাস-বাণী সম্বন্ধে অধিক আর কি বলা যাইবে ? জীবের তপ্ত-হৃদয়ে ইহার কতই প্রয়োজন ! এ জগতে তাপী কে নয় ? কাহার না আশ্বাস-বাক্য আবশ্যক ? যাহাতে প্রাণ জাগিয়া উঠে, হৃদয় সবল হয়, বুদ্ধি সংশয়-শূন্য হয়, মন বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করে, তাহাতে কাহার প্রয়োজন নাই ? যাহা সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করে, হতাশকে আশা দেয়, অলসকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, পাপী তাপীকে কুকর্ম্ম কুচিন্তা ত্যাগ করায়,—জগতে এমন সাধু হইয়া কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি " অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ " এই আশ্বাস-বাণীর প্রয়োজন বোধ না করেন ? এই 'অনাদি মোহ-নিশা-সুপ্ত' জীবজগতে অনবরত কত দুঃস্বপ্ন উঠিতেছে, 'জরামরণ-হর্ষামর্ষাদি-অনর্থসঙ্কুল কত বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে, এই 'তাপত্রিতয়-দাবানল-জ্বালা-মালাকুল সংসারারণ্যে' কত বিবেকান্ধ জীব নিরন্তর মোমুহ্যমান হইতেছে, 'অরিষড়্বর্গ-ব্যাধ-বধ্যমান প্রাণি-নিকর কণ্ঠ হইতে' কতই কাতরোক্তি নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? নিতান্ত দুঃখী জীবকে আনন্দ-নিদ্রায় নিদ্রিত করিতে ভগবান্ ভিন্ন আর কে সমর্থ ? ভগবদ্বাণী নির্জ্জীব হৃদয়ের সঞ্জীবনী মহৌষধি। গীতার মধুর-গীতি শ্রবণে প্রাণ আনন্দে নিদ্রিত হয়, গীতার মৃদুবেদান্ত-রসাস্বাদে চিত্ত-বালক হেলিয়া দুলিয়া সুন্দর খেলা করে। ভগবান্ শঙ্কর আত্ম-রসাস্বাদী চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহা গীতা-সুধা-পান-বিভোর সাধক-চকোরের গদ্গদ-মধুর ভাষা মাত্র. শঙ্কর বলিতেছেন -

যশোদা গীতমধুরৈ র্মৃদু বেদান্ত ভাষিতৈঃ।
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে ? ॥
নবনীতরসগ্রাস চমৎকারৈঃ স্বসম্বিদাম্
অন্তরাপ্যায়িতো বালো মুকুন্দ ইব খেলসি ? ॥
সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যো স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্।
নিজ শক্তি মুমাং পশ্যন্ মহেশ ইব নৃত্যসি ? ॥
দৃশ্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি।
মৃত্যুঞ্জয়-পদ প্রাপ্তঃ কিং নৃত্যসি হরো যথা ? ॥

যশোদার মধুর-গীতি শ্রবণে বাল-মুকুন্দের সুনিদ্রার ন্যায় গীতার মধুর আশ্বাস-বাণী ব্যাকুল জীবকে আনন্দ নিদ্রায় নিদ্রিত করুক। গীতার নবনীত রস গ্রাস সদৃশ আত্মাস্বাদনের চমৎকারিতা অশান্ত চিত্ত-বালককে আপ্যায়িত

করিয়া বাল-মুকুন্দের ন্যায় লীলাপরায়ণ করুক। বাসনাব্যাকুল জীব, গীতা-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সমাধি-সায়ংকালে স্নিগ্ধা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজ শক্তি উমার সন্দর্শন করিতে করিতে মহেশের মত আনন্দে নৃত্য করুক। আর দৃশ্য প্রপঞ্চরূপ গরল পান করিয়া, আত্ম-বোধে দৃশ্যজ্ঞানমার্জ্জন পূর্ব্বক, দেবদেবের মত মৃত্যুঞ্জয় পদ প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দ লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এস্থানে আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য—জগতের অন্যস্থানে যে যে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে আপনাদিগকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। কিন্তু গীতার সর্ব্ব স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে,'পুরুষোত্তম''পরমেশ্বর','অন্তর্য্যামী', 'ভগবান্', :'আত্মা', 'ক্ষেত্রজ্ঞ', ইত্যাদি বলিতেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সাধুকে কৃপা করেন, অসাধুকে শাস্তি প্রদান করেন, সংসারে যাহারা নরাধম তাহাদিগকে অজস্র অশুভ যোনিতে নিক্ষেপ করেন। ভগবান্ বলিতেছেন—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্র মশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।"

নির্গুণ পরমাত্মা মায়া-আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আত্ম-তত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ও গুণতত্ত্ব প্রকাশ করা দুঃসাধ্য কেন হইবে? যিনি অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, তিনিই আত্মমায়ায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পরমাত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়াও মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক লীলা করেন, ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। মানুষ আপনার গোপনীয় জঘন্য চরিত্র সর্ব্বদা অবগত থাকিলেও এই চরিত্র গোপন করিয়া লোক সম্মুখে ভদ্রোচিত আচরণ করে, বৃদ্ধ আপন স্বরূপ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াও বালক সাজিয়া বালকের সহিত খেলা করিতে পারে, নট নটী আপন আপন অবস্থা বিস্মৃত না হইয়াও রঙ্গমঞ্চে রাজা রাণীর অভিনয়ে লোক-সমাজ মুগ্ধ করিতে পারে, এ সকল যদি অসম্ভব না হয়, তবে ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়াও পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে লীলা করা অসম্ভব হইবে কি রূপে? বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন :—

চিৎপ্রকাশাত্মিকা নিত্যা স্বাত্মন্যেবাবসংস্থিতা।
ইদ মস্ত র্জগ দ্ধত্তে সন্নিবেশং যথা শিলা ॥

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৩১।৩৬

প্রকাশাত্মিকা নিত্যা চিৎ স্বরূপে অবস্থান করিয়াও স্ফটিকশিলা যেমন

আপনাতে বন-নদ্যাদির প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেইরূপ আপনার অন্তরে এই জগদ্ভাব ধারণ করিতেছেন।

অদ্বিতীয়া দধানেদং বিকারাদি-বিবর্জ্জিতম্।
নাস্তমেতি নচোদেতি স্পন্দতে নো ন বর্দ্ধতে॥

ঐ ঐ ৩৭।

অদ্বিতীয়া চিতি, নির্ব্বিকার ভাবে এই জগদ্ভাব ধারণ করিলেও, কদাচ অস্তমিত, উদিত, স্পন্দিত বা বর্দ্ধিত হইতেছেন না।

সঙ্কল্পাৎ জীবতা মেত্য নিঃসঙ্কল্পাত্মনাত্মনা।
চিজ্জড়ং নো জড়ং ভাবং ভাবয়ন্তি স্বসংস্থিতাঃ॥

ঐ ঐ ৩৭।

সঙ্কল্প-বলে ঐ চিতি, জীব-ভাবধারণ করিলেও নিঃসঙ্কল্প ভাবে আপনাতে অবস্থান পূর্ব্বক, এই জড়-জগৎ, অজড় বাস্তব ভাবে ভাবনা করতঃ স্ব স্বরূপেই অবস্থিত আছেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বেও কিছু বিশেষত্ব আছে। যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত, আর যাহারা তাহা পারে না, তাহারা মূঢ়, তাহারা রাক্ষসী ও আসুরী যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গীতা বলিতেছেন :—

মহাত্মানস্তুমাংপার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি মব্যয়ম্॥

হে পার্থ! দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মারা অনন্য-চিত্ত হইয়া আমাকে জগৎ-কারণ ও নিত্য স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন। আর :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনু মাশ্রিতম্।
পরং ভাব মজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘ-জ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

আমি ভূত-সমূহের পরমেশ্বর, আমার পরমভাব না জানিয়া মূঢ়গণ আমাকে মনুষ্য-শরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে। ইহাদিগের বিবেক থাকে না বলিয়া সমস্ত ফল প্রার্থনা মিথ্যা হয়। ইহারা ঈশ্বরঃবিমুখ বলিয়া ইহাদের কর্ম্মও নিষ্ফল, ইহাদের জ্ঞানও কুতর্কাশ্রয়ে নিষ্ফল হয়। ইহারা হিংসাদি বহুল তামসী-

প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং কাম-দর্পাদি-প্রচুর রাজসী-প্রকৃতি ইহাদের বুদ্ধি-ভ্রংশ করে। ইহাদের হৃদয়ে রাক্ষসের মত অন্য জাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও আচারাদির উপর একটা বিদ্বেষ থাকে। ইহারা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-বিষয় ভোগ-জনিত আসুর-ভাবও প্রাপ্ত হয়, এবং ভ্রষ্ট-মার্গ আশ্রয় করে। সমস্ত ষোড়শ অধ্যায় ধরিয়া এই আসুর ও রাক্ষস-ভাব-বিশিষ্ট মানবের ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানেই বলা হইয়াছে, রাক্ষসী আসুরী যোনি-জাত মনুষ্য অল্পবুদ্ধি, মলিন-চিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয়। বলা হইয়াছে—"প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।" ভগবান্ স্বহস্তে ইহাদিগের দণ্ড বিধান করেন। গীতার অবতার-বাদের এই সমস্ত বিশেষত্ব।

সাধ্য বিষয়ের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে সাধনার বিশেষত্ব উল্লেখ করা যাইতেছে। গীতোক্ত সাধন-মার্গসমূহের বিশেষত্ব নিষ্কামকর্ম্ম। লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্ম, আত্ম-সংস্থযোগ, ভক্তিযোগ, এবং জ্ঞানযোগ, সাধক ইহার যে কোনটী অবলম্বন করুন না কেন, সর্ব্ব প্রকার সাধনাতেই নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবহার রহিয়াছে। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম হইতে ফলকামনা বিগলিত করা, নিষ্কাম কর্ম্ম-উপাসনায় ও ভক্তিযোগে কেবল ঈশ্বর-প্রসন্নতা কামনা ও নিষ্কাম কর্ম্ম-জ্ঞানযোগে অহং অভিমান দূর করাও নিষ্কাম কর্ম্ম। কামনার স্থূল অবস্থাই কর্ম্ম। কর্ম্ম অভ্যস্ত হইয়া গেলে স্বভাবে পরিণত হয়; এই স্বভাব অনাদিকাল সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এই স্বভাব মনুষ্যের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্ম্ম-প্রবণ হয় না, কোন-কিছু নিমিত্ত পাইলেই কর্ম্ম হইয়া যায়। যাঁহারা ভগবানের প্রীতির জন্য পুরুষকার অবলম্বন করেন, তাঁহারাই আপন পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় করিতে সমর্থ হয়েন। সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ আশ্রয়ে স্থিতিলাভ করাই প্রারব্ধক্ষয়। এই অবস্থায় পূর্ব্বকৃতকর্ম্ম হইলেও সে কর্ম্মের লাভালাভ, জয়, পরাজয়, কোন ফল-কামনাতেই লক্ষ্য থাকে না, লক্ষ্য থাকে একমাত্র ঈশ্বর-প্রীতিতে। এইজন্য সমস্ত কর্ম্মই নিষ্কাম ভাবে সাধিত হয়। পুস্তক মধ্যে এই বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে, এজন্য এস্থলে ইহার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। গীতায় যতগুলি সাধন-ক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থানে আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে—সাধন-ক্রম গুলি স্বাভাবিক না কাল্পনিক? আমারা কর্ম্ম-সঙ্কেতে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব, এখানে এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে—ভগবান্ জীবকে ত্রিবিধ শক্তি প্রদান করিয়াছেন—প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। ক্রম অনুসারে প্রাণ, মন

ও বুদ্ধি পরিচালিত করিলেই আমরা যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান সাধনার এই ত্রিবিধ ক্রম প্রাপ্ত হই। যোগ সাধনার অত্যাবশ্যক কর্ম্ম প্রাণায়াম, ভক্তি সাধনার প্রধান কার্য্য মানস-পূজা ও জ্ঞান, সাধনার ভিত্তি—আত্ম-বিচার। প্রাণায়ামে শরীরের ও মনের বলাধান হয়, মানস পূজায় মন ভগবদ্ রস আস্বাদনে বিষয় ভোগ ত্যাগ করে, বিচারে আত্মা পরমাত্মার একত্ব স্থাপনে জীবন্মুক্তি লাভ করে। গীতা যে স্থানে এই ক্রম দেখাইতেছেন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্ম-যোগেন চাপরে॥
অন্যেত্বেব মজানন্তঃ শ্রুত্বাহ্ন্যেভ্য উপাসতে।
তে হ্পি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ১০।২৫

উত্তম অধিকারী সমাধি-সহকৃত ধ্যান যোগে শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা বুদ্ধিতে আত্ম-দর্শন করেন। মধ্যম অধিকারী সাঙ্খ্য-যোগে এবং মন্দ অধিকারী কর্ম্ম-যোগে দর্শন করিয়া থাকেন। অতি নিকৃষ্ট অধিকারী পূর্ব্বোক্ত সাধনা না জানিয়া আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গুরূপদেশ-পরায়ণ হয়েন বলিয়া মৃত্যুময় সংসার-সাগর অতিক্রম করিয়া থাকেন। এখানে আমরা দেখিতেছি আত্ম-দর্শনমাত্রই লক্ষ্য, তজ্জন্য ধ্যান যোগ, সাঙ্খ্য-যোগ, কর্ম্ম-যোগ এবং উপাসনা, ইহাই ক্রম। প্রথমে উপাসনা—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকিলেও উহাদের কর্ম্ম দূর হইতে একরূপ বোধ হইতে পারে। স্থূল দৃষ্টিতে তমো ও সত্ত্ব—গুণের সাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। বিশ্বাসে ও ভক্তিতে পার্থক্য আছে - বিশ্বাসীর ভক্তি ও ভক্তের ভক্তি; বিশ্বাসীর উপাসনা ও ভক্তের উপাসনা একরূপ হইতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তি উহাদিগকে একরূপ মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয়। উপাসনা, কর্ম্ম-যোগ, সাঙ্খ্য-যোগ এবং ধ্যান-যোগ সম্বন্ধে আমরা এস্থানে সঙ্ক্ষেপে দুই একটী কথামাত্র বলিয়া রাখিব। গীতার লক্ষ্যসঙ্কেতে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। এককালে জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার হয় না সত্য, কিন্তু প্রতিদিনের সাধনায় ইহাদের কার্য্য চলিবে, শাস্ত্র ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—

"জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েদ্ধ্যানাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্জ্জপেৎ।
জপধ্যান পরিশ্রান্ত আত্মানং চ বিচারয়েৎ"—

এক্ষণে সাধনার কথা বলা যাইতেছে।

১। উপাসনা।

ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" আমার শরণাপন্ন হও।

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ"—মনের নিবৃত্তি করিতে পারিতেছ না, "লয় বিক্ষেপ দূর করিতে পারিতেছ না, ইহাতেই বা তোমার ভয় কি? তুমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ চিন্তাকর, আমি তোমার সমস্ত পাপ-রাশি দূর করিয়া দিব, তুমি শোক করিও না। সর্ব্বদা আমাকেই লক্ষ্য কর, সর্ব্বকালে মনকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। মন যখন যখন অসুস্থ হইবে, তখনই ইহাকে আশ্রয় দাতার কথা স্মরণ করাইও, নির্ভয় হইয়া যাইবে। চিত্ত অপ্রসন্ন হইলেই ভগবান্ আত্মাকে স্মরণ করিয়া সুস্থ হইতে অভ্যাস কর। স্বামীর বিরহে কাতর হইয়া স্ত্রী যদি বাহিরে ঘুরিতে থাকে, তবে তাহার ব্যভিচার হয় মাত্র। এইরূপ ব্যভিচার তুমি করিও না।"

গীতার সাধনা নিষ্কাম-কর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সকাম কর্ম্ম হইতে গীতা আরম্ভ হয় নাই।

২। কর্ম্মযোগ।

যে ব্যক্তি বিশ্বাসী, সেই উপাসক হইতে পারে। সাধনার প্রথম অবস্থায় ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ, কিছুই বিচারের আবশ্যকতা থাকে না, কেবলমাত্র বিশ্বাস রাখিলেই হয় যে "তিনি মঙ্গলময়, তিনি আমার মঙ্গল করিবেন।" উপাসনা দ্বারা মনকে বাহিরে সুস্থ করিয়া কর্ম্মযোগে ইহাকে ভিতরে স্থির রাখিতে হইবে। ষট্চক্র মধ্যে মনকে প্রথম রাখিতে হইবে, ক্রমে মন কূটস্থ মধ্যে নিরন্তর থাকিতে অভ্যস্ত হইবে। ইহাই আত্ম-সংস্থ যোগ। কি লৌকিক, কি বৈদিক, সকল কর্ম্মই যখন সাধক নিষ্কাম-ভাবে করিতে অভ্যস্ত হয়, তখনই আত্ম-সংস্থযোগে আত্ম-রসাস্বাদনে আত্মদর্শনে সমর্থ হয়। কিন্তু আত্ম-সংস্থযোগ পরিপক্ক করিবার জন্য ভক্তিযোগের আশ্রয় লইতে হইবে। ভক্তিযোগে মন ভগবদ্রসাস্বাদন করিয়া শম, দম, ইত্যাদি সাধনে সবল হইতে থাকে। এখানে কর্ম্মযোগের দুইটী বিভাগ করা হইল। একটী অষ্টাঙ্গ যোগ এবং দ্বিতীয়টী ভক্তিযোগ।

৩। সাঙ্খ্য-যোগ।

মন, কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা যখন সুস্থ হইবে, যখন ঈশ্বর-রসাস্বাদনে আনন্দ পাইবে শরীর রোগদ্বারা পীড়িত হইবে না, প্রাণ রিপুকর্ত্তৃক চঞ্চল হইবে না,

চিত্ত তখন আপনিই বিচার করিতে সমর্থ হইবে। যাহার জন্য কর্ম্ম করি, যাহাকে উপাসনা করি, যাহার ভজনা করি তাহাকে দেখিতে, তাহাকে বুঝিতে, কাহার না ইচ্ছা হয়? সাঙ্খ্যযোগে বিচার মাত্র অবলম্বন। ঈশ্বর কে, কাহার শরণপন্ন হইয়াছি, কোথায় তিনি আছেন, কেমন করিয়া তিনি আমায় রক্ষা করিতেছেন, তিনিই ভগবান্ আত্মা, তিনি আমার অতি সমীপে, চিত্ত এই সমস্ত তত্ত্ব বিচার করিবে। বিচার করিতে করিতে বুঝিবে, তিনি এই দেহ নহেন, তিনি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার নহেন—তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় নহেন—জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শোনা যায়, তিনি তাহার কিছুই নহেন, অথচ তিনি আছেন। তিনি না থাকিলে দেহ জড়, জগৎ জড়, কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপে "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয়সদাঽনঘ।" ভগবান্ আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিয়া গুরুমুখে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইহা আরম্ভ করিতে হইবে।

৪। ধ্যান-যোগ।

ভগবান্ আত্মার কথা সৃষ্টি ও সংহার ক্রমে শুনিতে শুনিতে—গুরুমুখেও শাস্ত্রমুখে যাহা শ্রবণ করা হইল—একান্তে তাহারই মনন হইতে থাকিবে। দৃঢ়রূপে মনন আসিলেই ধ্যানযোগ আরম্ভ হইল, তখনই "তত্ত্বমসি" সাধনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাই আত্ম-দর্শন, ইহাই জীবন্মুক্তি।

বিনা আত্মজ্ঞানে মুক্তি হইবে না, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়, শ্রুতি বলেন। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতিনান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" জীব আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলেই মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করে, ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন—

সংসারোত্তরণে জন্তো রুপায়ো জ্ঞানমেবহি।
তপোদানং তথা তীর্থমনুপায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।
মৌর্খ্যা দীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষোঽভিবাঞ্ছ্যতে॥

যোঃ উঃ ৭৩।৩৭

একমাত্র জ্ঞানই জীবের সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায়; তপস্যা, দান বা তীর্থ, ইহারা উপায় নহে।

যে পর্য্যন্ত বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই সেই জীব মূর্খতা বশতঃ

দীনভাবে ভক্তি দ্বারা মোক্ষ কামনা করিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা গেল, ভক্তি আত্ম-জ্ঞানের উপায় বটে, কিন্তু ভক্তি আনন্দ-স্বরূপে স্থিতি প্রদানে অসমর্থ।

ভক্তি সম্বন্ধে বশিষ্ঠ দেবের উক্ত মত শ্রবণে, অনেকে যোগবাশিষ্ঠমহা-রামায়ণের উপরে অভক্তি প্রকাশ করেন, এবং শঙ্করাচার্য্যও ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভগবান্ শঙ্করকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ইহাদের বিচারে—ভগবান্ ব্যাসদেব কোথাও ইহা প্রকাশ করেন নাই, যে ভক্তিতে মুক্তি হয় না। বাস্তবিক আপাতদৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয় বটে। ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলিতেছেন "ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য, ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী" ভক্তি হইতেই জ্ঞান জন্মে এবং ভক্তিই মোক্ষ প্রদান করেন। অঃ রাঃ যুদ্ধকাণ্ড ৭। ৬৭। ভগবান্ ব্যাসের এই সমস্ত উক্তি সম্যক্ আলোচনা করিতে না পারিয়া এই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকে ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানী ইত্যাদির উপুর একটা ঘৃণা, প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসদেব সর্ব্বত্র ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যোগ, জ্ঞান বা ধ্যানের উপর কোথাও বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নাই, এবং ভক্তি মার্গের লোকে যোগ জ্ঞান ও ধ্যান সাধনা করিবেন না, একথা কোথাও বলেন নাই। "ভক্তিই মুক্তি" তিনি যে স্থানে বলিতেছেন, তাহা কোন্ অর্থে বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার কথা দিয়া উহা প্রদর্শন করিব, এবং আশাকরি, ব্যাসদেবের মতটী পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলে ভক্তি জ্ঞান ও মুক্তি এই ক্রম সম্বন্ধে বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়
স্ততো ভবেদ্ জ্ঞান মতীব নির্ম্মলম্।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ,
সম্যগ্বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ॥ অঃ রাঃ সুন্দর ৪।২২

ভক্তিতে সাধক কোন্ ভূমিকায় উপস্থিত হয়েন, ব্যাসদেব উপরের শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন। ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞান, পরে তত্ত্বানুভব হইলে পরম পদ প্রাপ্তি হয়। তথাপি তিনি যে বলিতেছেন "ভক্তিই মুক্তি" তাহার কারণ তিনি নিজেই বলিতেছেন—

"প্রথমং সাধনং যস্য, ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু।
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তিঃ, মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্॥"

ভক্তির যে সমস্ত সাধনা আছে ক্রম অনুসারে প্রথমটী হইতে আরম্ভ করিলে মুক্তি আসিবেই, এই জন্ম ব্যাসদেব ভক্তিকেই মুক্তি বলিতেছেন। ব্যাসদেবের মতে অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং তত্ত্ববিচারও ভক্তি সাধনার অঙ্গ।

সাধনমার্গে ভক্তির স্থান কোথায়, ইহা নিশ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক এজন্য আমরা ব্যাসদেব প্রদর্শিত ভক্তি সাধনার ক্রম এখানে উল্লেখ করিব।

তস্মাদ্ভামিনি সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্।
সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্ ॥২২
দ্বিতীয়ং মৎকথালাপ স্তৃতীয়ং মদ্‌গুণেরণম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ ॥ ২৩
আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে মদ্‌বুদ্ধ্যামায়য়া সদা।
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদি নিয়মাদি চ ॥ ২৪
নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে ॥ ২৫
মদ্ভক্তেষ্বধিকা পূজা সর্ব্বভূতেষু সম্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা ॥ ২৬
অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তি সাধনং যস্য কস্য বা ॥ ২৭
স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্‌যোনি গতস্য বা।
ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে ॥ ২৮
ভক্তৌ সঞ্জাত মাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভব স্তথা।
মমানুভব-সিদ্ধস্য মুক্তি স্তত্রৈব জন্মনি ॥ ২৯
স্যাত্তস্মাৎ কারণং ভক্তিঃ মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্।
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু ॥ ৩০
ভবেৎ সর্ব্বং ততোভক্তি মুক্তিরেব সুনিশ্চতম্ ॥ অঃ, রাঃ

অরণ্য ১০ অধ্যায়

প্রেমলক্ষণা ভক্তির সাধনক্রম নববিধ—(১) মৎসঙ্গ, (২) মৎ কথালাপ, (৩) মদ্‌গুণ স্মরণ, (৪) আমার বাক্য ব্যাখা, (৫) আচার্য্য ও আমি এক এই বদ্ধিতে

আচার্য্যোপাসনা ও যমনিয়মাদি যোগের বহিরঙ্গ-সাধনা, (৬) নিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা, (৭) মন্ত্রজপ; (৮) ভক্তপূজা "সর্ব্বভূতে নারায়ণ-বোধ," বিষয়-বৈরাগ্য ও শম সাধনা (৯) তত্ত্ব-বিচার। এই সমস্ত ভক্তি সাধনা দ্বারা প্রেম ভক্তি জন্মে। ভক্তি জন্মিলে আমার তত্ত্বের অনুভব হয়। আমার অনুভবই মুক্তি। এই কারণে ভক্তিকে মুক্তি বলা হইল; কারণ সাধনাক্রমের প্রথমটি হইতে আরম্ভ করিলে অন্য অন্য গুলি ক্রম অনুসারে আসিবেই। ব্যাসের এই মতের সহিত বশিষ্ঠ ও শঙ্করের মত একই। মূঢ় বুদ্ধিতেই গোঁড়ামি। আমরা ভাগবত হইতে ইহাই দেখাইতেছি। ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন :—

এবং প্রসন্ন-মনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্টএবাত্মনীশ্বরে ॥

১ম স্কন্ধ ৩।২০-২১

পরম বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিতেছেন "এব কারেণ জ্ঞানানন্তরমেবেতি সূচয়তি"।

নিষ্কাম কর্ম্মে ভগবৎ সেবা দ্বারা নৈষ্ঠিকী ভক্তি উৎপন্ন হয়। তখন রজস্তমোভাব এবং কাম লোভাদি চিত্তমল দূরীভূত হয়। চিত্ত, তখন সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়। ভক্তিযোগে চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, ইহাই মুক্তি। এইরূপে আত্মদর্শন সাধিত হইলেই হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্মক্ষয় হয়। টীকাকার শ্রীধরস্বামী কথাটী আরও পরিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীধর বলেন "দৃষ্টএব" শব্দে আত্মদর্শন হইলেই হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি দূরীভূত হয়, নৈষ্ঠিক ভক্তি দ্বারা নহে এখানে ভক্তি-যোগের নিন্দা করা হইতেছে না, যাহারা মোক্ষলাভের ক্রম-বিপর্য্যয় করিয়া, উপায়কে উদ্দেশ্যরূপে পরিণত করিয়া, সাধনকে বাধন করিয়া আটকাইয়া রহিতেছেন, তাহাদিগকেই সাবধান করা হইতেছে মাত্র।

ভগবান্ ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলিতেছেন—

"তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈশ্চ সাভাসস্যাহমস্তথা।
ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ ॥

তদাঽবিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
এবং বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি॥

ভক্তি, জ্ঞান এবং মুক্তি ইহাই ক্রম। বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই, বিনা জ্ঞানে মুক্তি বা আনন্দস্বরূপে স্থিতি নাই। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষ-প্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎ সমম্॥

যে কালে ভগবান্ শঙ্কর ধর্ম্ম-প্রচার করেন, তখনও কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, মুক্তির এই ক্রম সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রচলিত ছিল। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য মুক্তির ক্রম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠ ব্যাসাদি ঋষির মতই সমর্থন করিতেছেন, বলিতেছেন—

ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তি রস্তি যুক্তিশতৈপি।
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায় শতৈরপি।

জ্ঞান ভিন্ন শত যুক্তিতেও মুক্তি হইবে না। আবার ভক্তি ভিন্ন শত উপায় অবলম্বন করিলেও জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই।

ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তি রিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তাবৈ নারদাদয়ঃ॥

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, পরে মুক্তি ইহাই সাধারণ ক্রম। বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী এবং নারদাদি ভক্ত।

যাঁহারা বলেন যে ভক্তি ও জ্ঞানে কোনও পার্থক্য নাই, তাঁহাদের বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা এখনও হয় নাই। তবে এ কথা সত্য, যে পরমজ্ঞান ও পরা ভক্তির কোন পার্থক্য নাই। পরম জ্ঞান ও পরাভক্তির কথা যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থানে মুক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রের অভিপ্রায়েরও কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

"কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বাকষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে॥

সাক্ষাৎ মোক্ষং বিদুর্জ্ঞানং জ্ঞনং পরতরং মতম্।
তস্মাৎসর্ব্ব প্রযত্নেন জ্ঞানং সর্ব্বমুপাসিতম্ ॥
জ্ঞাতং তত্ত্ব বিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্।
পাপ্মানং তরতে জ্ঞানং জ্ঞানাৎসত্যংহিলভ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন জ্ঞানমেব সমাচরেৎ।
ন মুক্তি র্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতিজ্ঞাত্বা মুক্তোভবতি দেহভৃৎ ॥
আত্মজ্ঞান মিদং দেবি পরং মোক্ষৈক সাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃস্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

এই পীঠমালাতন্ত্রে মহাদেব আবার বলিতেছেন ঃ—

আত্ম-ভিন্নং পশ্যতশ্চ কল্পকোটে শতৈরপি।
নমুক্তি র্জায়তে দেবি তপোদানব্রতাদিভিঃ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রের যাহা মত, গীতার মতও তাহাই। তবে যে বলা হইয়াছে, ধ্যান-যোগ কর্ম্মযোগ বা উপাসনা ইহার কোন একটী অবলম্বন করিলেই মুক্তি, সে কেবল আত্ম-জ্ঞান লাভের ক্রম মাত্র। সাধনার ক্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইল। আমরা উপসংহারে মুক্তিকোপনিষদ্ হইতে আরও কতকগুলি উপায় দেখাইয়া এই আলোচনা শেষ করিলাম।

রাম কেচিন্মুনিশ্রেষ্ঠা মুক্তিরেকেতি চক্ষিরে।
কেচিৎ ত্বন্নামভজনাৎ কাশ্যাং তারোপদেশতঃ ॥
কেচিত্তু সাঙ্খ্যযোগেন ভক্তিযোগেন চাপরে।
অন্যে বেদান্তবাক্যার্থ বিচারাৎ পরমর্ষয়ঃ।
সালোক্যাদি বিভাগেন চতুর্দ্ধামুক্তি রীরিতা ॥

এই সমস্ত উপায়ে সালোক্য, সারূপ্য, সমাপ্য, সাযুজ্য ইত্যাদি মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু কৈবল্যমুক্তি বিনা জ্ঞানে সাধিত হয় না।

"অতএব ব্রহ্মালোকস্থা অপি ব্রহ্মমুখাৎ বেদান্ত শ্রবণাদিকৃত্বা তেন সহ কৈবল্যং লভন্তে, অতঃ সর্ব্বেষাং কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞান-মাত্রেণোক্তা, ন কর্ম্মসাঙ্খ্যযোগোপাসনাদিভি রিত্যুপনিষৎ।"

পরমানন্দস্বরূপে অবস্থিতি ভিন্ন জীবের সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি হইবে না। এই সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিই বা পরমানন্দে নিত্য স্থিতির নামই জীবন্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান রূপ উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীব এই কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিতে পারে, এইজন্য এই সমস্ত সাধনা ক্রম-অনুসারে আবশ্যক। শ্রুতি কৈবল্য-মুক্তির জন্য উপদেশ করিতেছেন।

মুমুক্ষবঃ পুরুষাঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবন্তং
সৎকুলভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাৎসল্যং গুণবন্ত মকুটিলং
সর্ব্বভূত হিতেরতং দয়াসমুদ্রং সদ্গুরুং বিধিবদুপ
সঙ্গম্যোপহার-পাণয়োঽষ্টোত্তর শতোপনিষদং বিধিব-
দধীত্য শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদি নৈরন্তর্য্যেণকৃত্বাপ্রারব্ধ-
ক্ষয়াদ্দেহত্রয়-ভঙ্গং প্রাপ্যোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ঘটাকাশবৎ
পরিপূর্ণতা বিদেহ মুক্তিঃ সৈব কৈবল্যমুক্তিরিতি”

সাধ্যবিষয়ের কথাও বলা হইল, সাধনার বিষয়ও বলা হইল। জীব যে মুক্ত হইতে চায় না ইহাও নহে। কিছুই যে চেষ্টা করে না তাহাও ত বলা যায়না। তবে জীবের যাহা লক্ষ্য তথায় যাইতে পারে না কেন ?

জীবের লক্ষ্য আর একবার চিন্তা কর। যিনি আত্মানুভব সন্তুষ্ট তিনিই জীবন্মুক্ত। লোক এই “আত্মানুভব সন্তুষ্ট” হয় না কেন ? এক সঙ্গে দুই রস ভোগ হইতে পারে না। যিনি বিষয়াস্বাদ করিতেছেন তিনি আত্মাস্বাদ পাইবেন কি রূপে ? যিনি দেহাস্বাদ করেন, তাঁহার কি আত্মাস্বাদ হয় ? আর এক সঙ্গে দুয়ের জ্ঞানও তিষ্ঠিতে পারে না। দেহজ্ঞান যাঁহার প্রবল তাঁহার আত্মজ্ঞান হইবে কি রূপে ? দেহ দর্শন বা বিষয় দর্শন যাঁহার হয় তাঁহার আত্ম দর্শন হইবে না। দেহ দর্শন করিতে করিতে “আমার দেহ”, “আমার দেহ” বোধ হয়, তখন দেহে আত্মভিমান জন্মে। “দেহ আমি” “দেহ আমি” এই বোধ প্রবল হইলেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়। দেহাভিমানজ শোক ত্যাগ কর এবং আত্মানুভব সন্তুষ্ট হও। “আমি দেহ নহি”, “আমি আনন্দস্বরূপ” এই দুয়ের অনুভবেই জীবন্মুক্তি।

“ধ্যানেনাত্মনি” ইত্যাদি শ্লোকে জীবন্মুক্তির সাধনার যে ক্রম গীতা দেখাইতেছেন, আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। সাধনার ক্রম দুইটী।

(১) সৃষ্টি ক্রম, (২) সংহার ক্রম। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দুঃখী জীব কিরূপে আসিল ইহা বুঝিতে পারিলেই দুঃখী জীবের নিত্যানন্দ প্রাপ্তির পথ পরিষ্কার হইল। ইহা সৃষ্টি ক্রম। আবার জীবের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান আছে তাহার বিচার দ্বারা যখন আনন্দ-স্বরূপ আত্মা পাওয়া যায় না, যখন প্রকৃতির কোন কিছুকেই আত্মা বলা যায় না অথচ আত্মা আছেন এই বোধ থাকে। আত্মার আভাস পাওয়া যায়, অথচ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না, এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা হয় তখনই আত্মস্বরূপ দর্শন হয়। ইহা সংহার ক্রম। সৃষ্টিক্রম ধরিয়া জীবন্মুক্তির পথ গুলি আর একবার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) জীবন্মুক্ত জানেন যে—

"অহং দেবোন চান্যোস্মিণ ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

জীবন্মুক্তের স্থিতি এই আনন্দের ধ্যানযোগে। (২) যিনি অহং "ব্রহ্মাস্মি" ধারণা করিতে পারেন নাই তিনি "প্রকৃতের্ভিন্ন মাত্মানং বিচারয় সদানঘ" ইহাই অনুশীলন করিবেন। ইহাই সাংখ্য-যোগ।

(৩) সাংখ্য-যোগে যিনি স্থিতি লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি উপাস্য বস্তুতে চিত্ত একাগ্র করিবেন, ইহাতেও অসমর্থ হইলে আত্মসংস্থ হইবার জন্য কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবেন। প্রাণায়াম ইত্যাদি বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি লাভ করিয়া আত্মসংস্থ হওয়াই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

(৪) যাহারা বৈদিক কর্ম্মযোগেও অসমর্থ, তাহারা লৌকিক কর্ম্মাদি করিবে, কিন্তু কর্ম্মের আদিতে ও কর্ম্ম শেষে "তুমি প্রসন্ন হও" এই ভাব বিস্মৃত হইতে পারিবে না, ইহাই উপাসনা। সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষাই উপাসনার উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত সাধন ক্রমগুলি কখন কখন প্রত্যহ আলোচিত হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন সাধন ক্রম মত কার্য্য অভ্যাস কালে সর্ব্বদা শেষ লক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, নতুবা উপায়ই উদ্দেশ্য হইয়া যাইতে পারে। এজন্য আমরা শেষ উদ্দেশ্যটি পুনরায় আলোচনা করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি।

অস্য দেবাধি দেবস্য পরস্য পরমাত্মনঃ।
জ্ঞানাদেব পরাসিদ্ধির্নত্বনুষ্ঠান দুঃখতঃ॥

ন হ্যেষ দূরে নাভ্যাসে না লভ্যো বিষমেণ চ ॥
স্বানন্দাভাস-রূপোঽসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে ॥
কিঞ্চিন্নোপ করোত্যত্র তপোদান ব্রতাদিকম্ ।
স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রাস্তি সাধনম্ ॥
সাধুসঙ্গম সচ্ছাস্ত্র পরতৈবাত্র কারণম্ ।
সাধনং বাধনং মোহ জালস্য যদকৃত্রিমম্ ॥
অয়ং সদেব ইত্যেব সম্পরিজ্ঞান মাত্রতঃ ।
জন্তোর্ন জায়তে দুঃখং জীবন্মুক্তত্বমেতি চ ॥

এই দেব দেব পরমাত্মার সহিত একত্বসিদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ হয়। অন্য ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে হয় না। তিনি দূরস্থ নহেন, নিকটস্থও নহেন সুলভও নহেন, দুর্ল্লভও নহেন। তিনি আপন আনন্দাভাসরূপ। নিজ শরীরেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

তপস্যা দান ব্রতাদি, তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী নহে। স্বরূপে অবস্থান ভিন্ন ইহার অন্য সাধনা নাই।

সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র এই দুইটি তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। ইহারাই মোহজালের অকৃত্রিম বিনাশ সাধন উপায়। 'ইনিই সেই দেব' এই জ্ঞান জন্মিবামাত্র জীবের আর কোন দুঃখ থাকে না। ইহাই জীবন্মুক্তি। "তস্মাদ্বিচারেণাত্মৈবান্বেষ্টব্য উপাসনীয়ো জ্ঞাতব্যো যাবজ্জীবং পুরুষেণ নেতরদিতি"। মুঃ ১৩।১০

যথা সম্ভবয়াবৃত্ত্যালোকশাস্ত্রাবিরুদ্ধয়া ।
সন্তোষ সন্তুষ্টমনা ভোগ গন্ধং পরিত্যজেৎ ॥ উঃ ৬।১৬

যথাসম্ভব শাস্ত্র অবিরোধী জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ভোগগন্ধ ত্যাগ করিবে।

সচ্ছাস্ত্র সৎসঙ্গমজৈর্বিবেকৈ, স্তথা বিনশ্যন্তি বলাদবিদ্যাঃ ।
যথাজলানাং কতকানুষঙ্গাৎতথা জনানাং মতয়োঽপি যোগাৎ ॥
যোঃ উঃ ৬।২২

যেমন কতক ফল (নির্ম্মল) দ্বারা জলের মালিন্য নষ্ট হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাসে বুদ্ধির মলিনতা দূরীভূত হয়। এবং সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রে যে বিবেক জন্মে তদ্দ্বারা অবিদ্যা বা সংসারমায়া দূর হয়।

নশ্যতি সংস্থতি-দুঃখমিদং তে, স্বাত্মবিচারণয়া কথয়ৈব।
নো ধনদানতপঃশ্রুতবেদৈ, স্তুৎকথনোদিত-যত্ন শতেন ॥

যোঃ বাঃ. উঃ ৮।২২

আত্মজ্ঞান ও আত্মকথা ভিন্ন দান, তপ, বেদপাঠ বা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কিছুতেই সংসার ক্লেশ দূর হইবে না।

দ্বিতীয় কথা।

গীতায় শক্তিসঞ্চার।

শক্তি সঞ্চার কার্য্য দ্বারাও সম্পাদিত হয় এবং জীবন্ত-বাক্য দ্বারাও হইয়া থাকে। এখানে শেষোক্ত শক্তি সঞ্চার আলোচিত হইবে।

আলস্য এবং অনিচ্ছা জগতের কতই না অনিষ্ট করিতেছে! শাস্ত্র যথার্থই বলিতেছেন—

আলস্যং যদি ন ভবেজ্জগত্যনর্থঃ, কো ন স্যাদ্বহুধনো বহুশ্রুতোবা
আলস্যাদিয়মবনিঃ সসাগরান্তা, সম্পূর্ণ-নরপশুভিশ্চনির্দ্ধনৈশ্চ ॥

আলস্যই যদি জগতের অনর্থভূত না হইত, তবে জগতে বহুধন উপার্জ্জন না করিত কে? আর বহুজ্ঞান কে না লাভ করিত? এই সসাগরা ধরা যে মূর্খ নরপশু ও দরিদ্র মনুষ্যে পূর্ণ, আলস্যই তাহার কারণ। সকলেই কিন্তু আলস্য ত্যাগ করিতে পারে, সকলেই চেষ্টা করিলে আপন অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারে।

সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে ॥

এই সংসারে সম্যক্‌রূপে পৌরুষ প্রয়োগ করিলে সকলেই সকল বিষয় সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে—এই উক্তি ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের। সর্ব্বশাস্ত্রে পৌরুষের কথা আছে। গীতার উত্তেজনা বড়ই প্রাণস্পর্শী। "ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ" ইহাই কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিমনায়মান অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের প্রথম উপদেশ। উত্তেজনা জীবনে নিতান্ত আবশ্যক।

জীবন্ত-বাক্য নিমেষ মধ্যে সুপ্তপ্রাণকে জাগ্রত করে। "উত্তিষ্ঠ", "জাগ্রত" ইত্যাদি জীবন্ত-বাক্য আদিতে শক্তি সঞ্চার করে, আবার অন্তে "তত্ত্বমস্যাদি" জীবন্ত-মহাবাক্য পূর্ণশক্তি জাগ্রত করে, পূর্ণশক্তিকে শক্তিমানে মিশাইয়া জীবন্মুক্তি প্রদান করে।

জীবন্ত-বাক্য সর্ব্বদা উপকারী। আবার যখন জীবন্ত-বাক্য উপদেষ্টার অশ্বাস-সঞ্চারী মধুর হাস্যের সহিত মিলিত হয়, যখন ইহা সর্ব্বসন্তাপনাশী শীতল করুণ দৃষ্টির সহিত জড়িত হয়, যখন গুরুর মৃদু অঙ্গুলী সঙ্কেতে দ্রুত-সঞ্চারী কথা-তড়িৎ হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়-গুহাশায়ী তমঃ প্রকৃতিকে জ্বালাইয়া দেয়, যখন তমঃ প্রকৃতি বিজলীমালা-বিজড়িত রক্তাম্বরে বিভূষিত হইয়া রজঃ প্রকৃতিতে পরিণত হয়, তখন জীব মোহ অপসারিত করিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য সগর্ব্বে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থায় কার্য্যসিদ্ধির অধিক বিলম্ব হয় না। মন জাগিয়া উঠিলে সাত্ত্বিক উপদেশ রজঃপ্রকৃতিকে শুভ্রবস্ত্র পরাইয়া দেয়, আর রজঃই তখন ধীরে ধীরে সত্ত্বরূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় জাগ্রত-কর্ম্মী শান্তভাবে আপন কর্ম্মটি বুঝিয়া লয়, এবং সতর্ক হইয়া ধীরে ধীরে প্রবল পুরুষকার সহকারে কর্ত্তব্যের গন্তব্য পথে চলিতে থাকে। শ্রীগুরুর স্নেহপূর্ণ বাক্য, তাঁহার সহাস্য উপদেশ, দুর্ব্বল চিত্তকে বল দিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে।

কিন্তু বিনা সাধনায় চিত্ত অধিকক্ষণ ঊর্দ্ধে থাকিতে পারে না। পক্ষিশাবক যখন প্রথম উড়িতে শিক্ষা করে, তখন তাহার বিপদ যেরূপ, এই চিত্তের অবস্থাও সেইরূপ। চিত্তকে সর্ব্বদা সবল রাখিবার জন্যই কর্ম্ম অভ্যাস আবশ্যক। বিনা অভ্যাসে গুরুদত্ত শক্তি জীবিত থাকে না। নিয়ম মত কর্ম্ম করিতে করিতে গুরু-সঞ্চারিত শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই অবস্থায় সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র শক্তির স্থায়িত্ব সাধনে বিশেষ উপকার করে।

যেমন সংসার-সমরে সাধারণ জীব অনেক সময়ে কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হয়, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়, সেইরূপ অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র সমরারম্ভে মোহগ্রস্ত হইয়াছেন, কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিয়াছেন, আর পরম কারুণিক ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন, বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠ"। দেহ-রথে রথী অবসন্ন হইয়াছে, নিশ্চেষ্ট হইয়া সকল উদ্যম ত্যাগ করিয়াছে, আর ভগবান্ সারথি-রূপে রথীকে উত্তেজিত করিতেছেন—

'রে জীব! তোমায় আপন আনন্দরাজ্য উদ্ধার করিতে হইবে। অজ্ঞান-অসুর তোমার জ্ঞান-রত্ন চুরি করিয়াছে, তুমি আপন আনন্দরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছ, হৃতরাজ্য উদ্ধার করিবার এইত সময়। জাগ্রত হও। কি জন্য মূঢ়ের মত অবস্থান করিতেছ? গুরু কার্য্যকাল উপস্থিত। এখন কি নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময়? উঠ, আপন পৌরুষ প্রদর্শন কর। আলস্য, অনিচ্ছা দূরে নিক্ষেপ কর। অন্য অভিলাষ ত্যাগ কর, অন্য উন্মত্ত-চেষ্টা দূর কর। এই অনার্য্যসেবিত মোহ কি আর্য্যের উপযুক্ত? মোহগ্রস্থের ইহলোকেও অযশ, পরলোকেও অধর্ম্ম। অর্জ্জুন! তুমি কাতরতা ত্যাগ কর। তুমি কি ইহার যোগ্য? "ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ! নৈতৎত্বয়্যুপপদ্যতে", তুমি ক্লীবত্ব ত্যাগ কর'।

শ্রীভগবান্ জীবের মঙ্গল জন্য যাহা যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার আশ্বাস-বাণী উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। জীবকেও শ্রীভগবানের জন্য কিছু করিতে হইবে। তিনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, জীবকে তাহা পালন করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট-জীবের প্রতি ভগবানের আশ্বাস-বাক্য কোন কার্য্য করিবে না।

শ্রীভগবান প্রথমেই অর্জ্জুনকে উৎসাহ দিয়াছেন। অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে হইবে—জীবকে ভগবানের কথামত কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু যেমন তেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে চলিবে না। জীব বৈদিক বা লৌকিক যে কর্ম্মই করুক না কেন, কর্ম্ম নিষ্কাম হওয়া চাই। নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার প্রথম শিক্ষা। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা এককালে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কর্ম্মদ্বারা জগতের অভ্যুদয় হইবে, জগচ্চক্র ঠিক পথে চলিবে। আবার কামনাত্যাগ জন্য জীবও জীবন্মুক্তি পথে চলিতে থাকিবে। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই জগতের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় এবং জীবের সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির সোপান।

এ স্থানে আমরা জীবের প্রতি ভগবানের আজ্ঞা-বাক্যগুলি একত্র করিতেছি। যেরূপ বিপদের অবস্থাতেই জীব পতিত হউক না কেন, ভগবানের আজ্ঞা স্মৃতিপথে জাগ্রত করিলেই ভগবান্ চক্ষুজল মুছাইবেন, জীবকে শান্ত করিবেন। তখন দুঃখ আর দুঃখ প্রদান করিতে পারিবে না, বিপদ আর বিপদ থাকিবে না। ভগবান্ সহায়—ইহা অনুভূত হইলে আর কি কোন বিপদ থাকে?

ভগবানের আজ্ঞা—

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২।১১

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ২।১৩

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ২।১৪

সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২।১৫

ভগবান্ বলিতেছেন মূর্খের মত শোক করিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। দুঃখ সহ্য করিতে অভ্যাস কর। সুখে দুঃখে যদি ধৈর্য্য রাখিতে পার, অমর হইয়া যাইবে।

মানুষের যত প্রকার দুঃখ, তাহা দেহসম্পর্কেই জাত। আহার, নিদ্রা, মৃত্যুভয়—সমস্তই দেহ জন্য। কিন্তু

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ।

অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাৎযুধ্যস্ব ভারত ॥ ২।১৮

আত্মার বিষয় জান' দেখিবে আত্মার বিনাশ হয় না, কিন্তু দেহ সর্ব্বকালেই বিনাশ-শীল। বল—শোক কাহার জন্য করিবে?

"ন ত্বং শোচিতু মর্হসি", ভগবানের এই আজ্ঞা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আহার না পাইলে, নিদ্রা না হইলে, আত্মার কোন ক্ষতি নাই। কোন হিংস্র জন্তু হইতে আত্মার ভয় নাই। ভয় কেবল, দেহকে আত্মা ভাবিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া, -যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনিই জীবন্মুক্ত, নির্ভয়। জ্ঞানী সকল অবস্থাতেই নির্ভয়, চিন্তাশূন্য, বিপদ্শূন্য। চিন্তা, বিপদ, ভয়—অজ্ঞানীর। সুখ দুঃখ সমস্তই অজ্ঞান-জনিত।

"তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি" ॥ ২।২৪

ভগবান্ স্বধর্ম্ম পালন করিতে বলিতেছেন, ইহা শাস্ত্রলিখিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতু মর্হসি ॥ ২।৩১

ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২।৩৩

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না, কীর্ত্তি অগ্রাহ্য করিও না, ইহা পাপ জানিও।

আবার বলিতেছেন :—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২।৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২।৩৮

সুখ হউক বা দুঃখ হউক, লাভ হউক বা অলাভ হউক, জয় হউক বা পরাজয় হউক, তুমি আমার আজ্ঞা মত চল। যদি এই কর্ম্মে মৃত্যু হয় তবে স্বর্গ লাভ হইবে, যদি জয়লাভ হয় পৃথিবী-ভোগ হইবে। মৃত্যু হয় হউক, কাজ করিয়া চল। মৃত্যু বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, আত্ম-জ্ঞানহীনতাই মৃত্যু।

সমস্ত গীতা ধরিয়াই উপদেশ। আমরা কতকগুলি সংগ্রহ করিতেছি ঃ—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ॥ ২।৪৮
সমাধাবচলাবুদ্ধি স্তদাযোগ মবাপ্স্যসি ॥ ২।৫৩
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ২।৬১
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে ॥ ৩।৪
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৩।৮
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩।১৬
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩।১৭
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মাণি বিদ্বান্যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩।২৬
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যাস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়ো র্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩।৩৪
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৩।৪৩
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪।৪২
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫।২৯
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ॥ ৬।৪,
মনঃ সংয়ম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬।১৪
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬।২৫

তস্মাদ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৬।৪৬

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥ ৬।৪৭

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ৭।২২

জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ॥ ৭।২৯

অধিক উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। আমরা আর দুই একটি প্রধান উপদেশ তুলি :—

১। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯।২৭

২। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু ॥ ৯।৩৪

৩। মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমোমদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্ব-ভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫

৪। মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬

৫। তস্মাত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্বারাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥
১১।৩৩

জীবের হতাশ হইবার কোন কথাই নাই। শ্রীভগবান্ অনন্ত প্রকারে জীবকে উৎসাহ দিতেছেন, বড় আদর করিয়া পথ দেখাইয়া দিতেছেন, যাহা যাহা করিতে হইবে সমস্তই বলিয়া দিতেছেন। 'যুদ্ধ কর' কারণ এই কর্ম্মে জগতের অভ্যুদয় হইবে। নিষ্কাম হইয়া যুদ্ধ কর—ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন বলিয়া যুদ্ধ কর—তুমি মুক্তি পথে চলিবে। যেমন বিনা কর্ম্মে জগতেব উন্নতি অসম্ভব সেইরূপ বিনা সঙ্কল্পক্ষয়ে, বিনা কমনা ত্যাগে, কোটিকল্প বৎসর অতি উগ্র তপস্যা করিলেও মুক্তি হইবে না। মুক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে পরমানন্দে স্থিতি হওয়া অসম্ভব। কুরুক্ষেত্র সমরে ভগবান্ কোটি কোটি ক্ষত্রিয় বিনাশ করিলেন, লোকে ভাবিতে পারে—আজ ভারতের দুর্গতি সেই জন্য। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যদি কুরুক্ষেত্র সমরে দুষ্কৃতের বিনাশ না হইত, আর ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ গীতা প্রচারিত না হইত, তবে আমরা সত্যযুগের আশা কখনও করিতে পারিতাম না। আজ অতি দুর্দ্দিনেও গীতার প্রচার কি

সূচনা করিতেছে—সর্ব্বজাতি মধ্যে গীতার ভাব প্রবেশ করিয়া কাহার আগমন সংবাদ দিতেছে, সুধী ব্যক্তি তাহা বুঝিবেন।

জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য 'মাতেব হিতকারিণী' শ্রুতিও গীতার মত শক্তি-সঞ্চার করিতেছেন, বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

আত্মদর্শনে যত্নশীল মুমুক্ষু! উঠ, বিষয় ত্যাগ কর। তত্ত্বজ্ঞ গুরু লাভ করিয়া আত্মাকে জান। সেই জ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হও। অজ্ঞান-নিদ্রা ত্যাগ কর। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারা যেমন দুরাক্রম্য, সেইরূপ উক্ত জ্ঞানের পথসমূহকে জ্ঞানিগণ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে শ্রুতি ত বলিতেছেন—বিষয় ত্যাগ করিতে, আর গীতা বলিতেছেন—যুদ্ধ করিতে, দুইই এক কথা কিরূপে? জীবের লক্ষ্য জগতের উন্নতি ও জীবন্মুক্তি। যে মনুষ্য নিতান্ত অজ্ঞান তাহার গতি প্রবৃত্তি মার্গে। প্রবৃত্তি পথে কখনও জগতের উন্নতিও হইবে না জীবনমুক্তিও হইবে না—হইবে আত্মহত্যা এবং জীব হত্যা। আর যিনি জীবিতোদ্দেশ্য অবগত হইয়াও বিষয় কামনা ছাড়িতে পারিতেছেন না, অথবা বিষয় কামনা উৎপাটন না করিয়া একেবারে নিবৃত্তি মার্গে যাইতে চাহেন, ভগবান্ তাহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া গীতায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পথ প্রদর্শন করাইতেছেন। আর যাঁহার আদৌ বিষয় বাসনা নাই, যাঁহার "ভুবি ভোগান রোচন্তে", কেবল তাঁহারই জন্য নিবৃত্তি মার্গের সাধনা। ইহা না হইলে জীবন্মুক্তি হইবে না। সত্যকথা, শ্রুতি বলিতেছেন—বিষয় ত্যাগ করিতে; কিন্তু বিষয় ত্যাগ, সকল মনুষ্যের একরূপে হইতে পারে না। সাময়িক উত্তেজনায় বৈরাগ্য কখন কখন উদয় হয়, সত্য—সাধু সজ্জনের কথা শুনিয়া, তাহাই শাস্ত্রে সমর্থিত হইতে দেখিয়া, ক্ষণ-কালের জন্য বৈরাগ্য উদয় হইতে পারে সত্য, প্রকৃতির তীব্র কষাঘাতে, প্রিয় পুত্র-কন্যাদির মৃত্যু-দর্শনে, ক্ষণকাল চিত্ত বিষয় ত্যাগ করে সত্য, কিন্তু ইহার নাম মর্কট-বৈরাগ্য। উত্তেজনা শিথিল হইলেই, ভোগবাসনা জাগিয়া উঠে। গীতা এই প্রবৃত্তির মনুষ্যকে নিবৃত্তি মার্গে লইয়া যাইতেছেন,—বলিতেছেন, যত দিন দেখিবে ভোগবাসনা আছে, ততদিন কর্ম্ম কর। কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে, ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম

কামনা ত্যাগের কৌশল মাত্র। বিষয়-কামনা দূর না হইলে কখন আত্মজ্ঞান জন্মিবে না—বিষয় আস্বাদনের কামনা থাকিতে থাকিতে কখনই আত্মাস্বাদন কামনা জাগিবে না। শ্রুতি বিষয় ত্যাগরূপ মূল কথা বলিয়াছেন, গীতা উহার উপায় পর্য্যন্ত বলিতেছেন, বলিতেছেন—ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। প্রবৃত্তি মার্গের জীবকে একবারে নিবৃত্ত মার্গের উপদেশ গীতা দিতেছেন না; বলিতেছেন, প্রবৃত্তির কর্ম্ম ছাড়িতে পার না, প্রথম প্রথম কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বর প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর, এই নিষ্কাম কর্ম্মে একেবারে দুই কর্ম্ম সাধিত হইবে। কর্ম্ম দ্বারা জগচ্চক্র সঞ্চালিত হইবে এবং কামনা ত্যাগ দ্বারা জীব মুক্তিপথে চলিতে পারিবে। অদ্ভুত শিক্ষা এই নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ! যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানভূমিকা কর্ম্মভূমিকার উপরে। জীব নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ক্রমে সাধনামার্গের উচ্চ উচ্চ স্তরে যত উঠিতে থাকিবে, ততই তাহার বিষয় ত্যাগ হইবে। সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় উঠিলেই সম্পূর্ণরূপে বিষয় ত্যাগ হইয়া যাইবে। ইহাই আত্মজ্ঞানের সময়, আত্মাস্বাদনের অবস্থা। গীতা ও শ্রুতি, এক কথাই বলিতেছেন।

যদিও গীতা নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চ উচ্চ অবস্থা একটীও ত্যাগ করেন নাই। 'হট্' করিয়া কোন কিছুই উপদেশ দেন নাই।

পুনরুক্তি সকল স্থানে দোষের হয় না। জীবন্মুক্তির ক্রম-মতে প্রতিদিন সাধনা করিতে হইবে। যাহা প্রতিদিন অভ্যাস করিতে হয়, তাহার পুনরুক্তিই আবশ্যক। আমরা আর একবার ক্রমগুলি উল্লেখ করিব। যথায় যাইতে হইবে, যাহা করিতে হইবে, প্রতিদিন তাহার আলোচনা আবশ্যক।

জীব! তোমাকে জীবন্মুক্তি লাভ করিতে হইবে। পথ বড় দুর্গম—কিন্তু পথ অনতিক্রমণীয় নহে! সংসার-সাগর পার হওয়া যায়, মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, পুনর্ব্বার জন্ম হওয়া রহিত হয়, নিত্য আনন্দে, নিত্যজ্ঞানে, স্থিতি লাভ হয়।

তুমি অন্য অভিলাষ ত্যাগ কর পারিবেই। লৌকিক কর্ম্ম করিতে হয় করিও, কিন্তু সচ্চিদানন্দ-তৃপ্তি জন্য করিও। উপাসনা, আত্মসংস্থযোগ, ভক্তিযোগ, সাংখ্যযোগ ও ধ্যানযোগ অবলম্বন কর। ধ্যানযোগ গীতার সাধনা। যেমন ভক্তিযোগ আত্মসংস্থ হইবার জন্য, সেইরূপ সাংখ্যযোগ ধ্যান জন্য। সমাধিধ্যানযোগে নিরন্তর থাকিতে না পার, সাংখ্যযোগে নিম্নভূমিকায় আইস, সাংখ্য যোগে বিচার দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক

বোধ কর, আবার সমাধি-ধ্যানে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। সাংখ্য যোগেও যখন "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানম্" বিচার না আসিবে, তখন ভক্তিযোগ অবলম্বন কর। এই ভক্তিযোগ কেবল আত্ম-সংস্থযোগ দৃঢ় করিবার জন্য। মানস পূজা ভক্তি যোগের শেষ কথা। সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তার বিশ্বরূপ চিন্তা কর, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণীর মায়ামানুষ মূর্ত্তি ধ্যান কর, অর্দ্ধ-নারীশ্বরের কথা গান কর, গুণ স্মরণ কর, রূপ ধ্যান কর, ভগবান্ আত্মার যে রূপ তোমার প্রাণে লাগিয়াছে, তাহারই ধারণা ধ্যান করিতে থাক: যদি দেখিতে পাও ভিন্ন ভিন্ন রূপেও তোমার প্রীতি, তুমি সেই ক্ষেত্রে পরম ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কুলগুরুর আশ্রয় লইও। তাঁহার লীলা চিন্তা কর; জীবশক্তি, আপন সহচরী সঙ্গে ভগবান্ আত্মার অপেক্ষা করিতেছে, অনুভব করিতে থাক; প্রিয়-সম্ভাষণে যাহা যাহা আবশ্যক—সুন্দর পুষ্পশয্যা, সুন্দর রত্ন কল্পিত আসন, স্নানার্থ জল, পরিধান জন্য দিব্যাম্বর, পূজার জন্য চন্দন, মৃগমদ-পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ভোজন, নৃত্য, গীত—এই সমস্ত মনে মনে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠা-স্ফুটিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছ, আর অনুভব করিতেছ—তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না—এই ভাবনা করিতে ২ কাতর হইয়া পড়'; কখন ভাবনা কর, যখন তুমি আসিবে তখন আমি কিরূপ ব্যবহার করিব, কেমন করিয়া তোমার সহিত কথা কহিব? কিরূপ ভাবে তোমার সেবা করিব! কখনও বা অভিমান করিব -এত দেরী করিয়া আসিলে কেন? তুমি ভিন্ন আমার আর যে কেহ নাই—এই সমস্ত অভ্যাস করিতে থাক। এতদ্দ্বারা আত্ম-সংস্থযোগ দৃঢ় হইবে। এই ভক্তিযোগও যখন না পার, তখন আত্মসংস্থ হইবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ও প্রত্যাহার দ্বারা প্রাণকে ভগবান্ আত্মার গৃহে গৃহে উঠিতে নাবিতে অভ্যাস করাও, চক্রে চক্রে মনোযোগের সহিত ভ্রমণ করিতে থাক, শেষে আর উঠিতে নাবিতে ইচ্ছা হইবে না। তখন মন আজ্ঞাচক্রে স্থির হইয়া জ্যোতিঃ সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিবে, মন আর কিছুই চিন্তা করিতে পারিবে না। "মনোনিবৃত্তি" হইবে. "পরম শান্তি" তুমি প্রাপ্ত হইবে, আবার আত্মসংস্থ হইয়া যাইবে। গীতা বলিতেছেন—"শনৈঃশনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যাধৃতি গৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥" যোগের বহিরঙ্গ সাধন দ্বারাও মন যদি কখন কখন বিষয়ে ভ্রমণ করে "যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্," তখনই ভক্তিযোগ দ্বারা তাহাকে আবার আত্মসংস্থ কর তোমার সমাধি লাগিবে।

মন, যখন প্রাণায়ামাদিতে অসমর্থ হয়, যখন লয়বিক্ষেপে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ক্লেশ পাইতে থাকে, তখন ইহাকে উপাসনা করিতে উপদেশ কর। বিশ্বাসে উপাসনা, ভক্তিতে মানস পূজায় প্রত্যক্ষ দর্শন। এ অবস্থায় সর্ব্বদা মনকে স্মরণ করাইতে হইবে—রে মন! তুমি কাহার শরণাপন্ন হইয়াছ, তাহা কি তোমার মনে নাই? তোমার কোন চিন্তা নাই, কোন ভয় নাই, তুমি সমস্ত সংশয় দূর কর—সমস্ত ভাবনা ত্যাগ কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই। প্রতি দুর্ব্বলতায়, প্রতি কর্ম্মে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর। সকল কর্ম্ম কর এবং কর্ম্ম দ্বারা উপাসনা করিও।

দেখা গেল, ক্রম অনুসারে উপাসনা, যোগ, ভক্তি, সাংখ্যজ্ঞান এবং সমাধি-ধ্যান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, আত্ম দর্শন হয়, জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। যিনি ভগবান্ আত্মার দর্শনলাভ করিতে পারিতেছেন না, তিনি নিরন্তর ধ্যান-যোগ অভ্যাসে, আত্মদর্শনার্থ আপনাকে উপযোগী করিবেন। ধ্যানে থাকিতে না পারিলে ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ সাহায্যে আত্মসংস্থ হইতে হইবে, ইহাও না পারিলে উপাসনা দ্বারা যোগ, ভক্তি, ধ্যান-যোগ-সৌধে ক্রম-অনুসারে আরোহণ করিয়া আত্মজ্ঞান ও আত্মদর্শন লাভ করিতে হইবে, ইহাই মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। শ্রুতির উপদেশ মত গীতাশাস্ত্রও জীবকে এইরূপে মুক্তি পথে লইয়া যাইতেছেন।

গীতাও বলিতেছেন—জীব তুমি জীবন্মুক্তির জন্য পুরুষার্থ কর, অর্জ্জুন রক্ষণের ভার তোমার আশ্রয় দাতাই গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া, নির্ভয় হইয়া, সাধনা করিতে থাক, তুমি পারিবেই। জীব "উত্তিষ্ঠতজাগ্রত,"। এই কার্য্যের জন্য উঠ আনন্দধামে স্থিতিই তোমার লক্ষ্য।

লয় বিক্ষেপ পীড়া জন্মায়, ইহা তোমার পূর্ব্ব দুষ্কৃতির পরিচয়। সাধক! ইহাতে হতাশ হইও না।

"ত্যজন্ত্যুত্তমমুদ্যুক্তা ন স্বকর্ম্মাণি কেচন"

কোন উদ্যোগশীল পুরুষ স্বকর্ম্মে উদ্যোগ ত্যাগ করে না।

যাহা কল্য করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা অদ্যই সম্পাদন করিবে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

শ্বঃকার্য্যমদ্যকর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপচাহ্নিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবাহ্ কৃতম্॥

প্রতিদিনের কার্য্যে লয়বিক্ষেপরূপ প্রাক্তন অশুভ যতক্ষণ না কাটাইতে পার, ততক্ষণ পুরুষার্থ প্রয়োগ করিবে।

তাবৎ তাবৎ প্রযত্নেন যতিতব্যং সু পৌরুষম্।
প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশুভং শ্যাম্যতি স্বয়ম্॥

যতক্ষণ না ঐহিক সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয়, ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্মে যত্ন করিবে। প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। ভাবী দোষ যে ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা দূরীভূত হয়, তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত।

দোষঃশাম্যত্যসন্দেহং, প্রাক্তনোঽদ্যতনৈর্গুণৈঃ।
দৃষ্টান্তোঽত্র হ্যস্তনস্য দোষস্যাদ্যগুণৈঃ ক্ষয়ঃ॥

লয়বিক্ষেপরূপ পূর্ব্বকর্ম্মদোষ, প্রত্যহ পুরুষার্থ-প্রয়োগে বিনাশ করিতে হইবে। ইহাই ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের উৎসাহবাক্য। মানুষের এ সামর্থ্য আছে। দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া আলস্য, অনিচ্ছা, অনুদ্যম, ত্যাগ করিতে হইবে। "বুদ্ধি ও শাস্ত্র সহকারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া যাহা সিদ্ধ করা যায় না, এমন কার্য্যই নাই"। যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ২৯ সর্গ

অসদ্দৈব মধঃ কৃত্বা নিত্যমুদ্রিক্তয়া ধিয়া।
সংসারোত্তরণং ভূত্যৈ যতেতাধাতু মাত্মনি॥
ন গন্তব্য মনুদ্যোগৈঃ সাম্যং পুরুষগর্দ্দভৈঃ।
উদ্যোগস্তু যথাশাস্ত্রং লোকদ্বিতয়সিদ্ধয়ে॥

আপন উদ্যোগশীল বুদ্ধি দ্বারা যাহা যাহা করিতে হইবে—তাহার আলোচনা কর, দৈব অধঃকৃত হইয়া যাইবে, পুরুষার্থ জাগিবে, তখন সংসারোত্তরণ জন্য একদিকে মনোনিগ্রহ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি কার্য্যে লাগিয়া যাও, অন্য দিকে শান্তমন ও শান্ত ইন্দ্রিয়কে আপন প্রিয় আত্মাতে লাগাইয়া দাও—সংসার উত্তীর্ণ হইবে।

পুরুষগর্দ্দভের মত উদ্যোগহীন হইও না। শাস্ত্রানুযায়ী উদ্যোগ ইহ-লোক এবং পরলোক, উভয় লোকের উপকারী।

অনর্থঃ প্রাপ্যতে যত্র শাস্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ।
অনর্থকর্ত্তৃ বলবৎ তত্র জ্ঞেয়ং স্বপৌরুষম্॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দ্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥

যথায় শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম করিলেও অনিষ্টপাত হয়, তথায় বুঝিবে, অনিষ্ট-জনক পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম তোমার প্রবল। তখন অতিদৃঢ়ভাবে প্রবল পুরুষার্থ দেখাইবে। জীবন যায় যাক্, আমি এই শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবই, স্থির করিয়া দন্তে দন্ত বিচূর্ণ করিতে করিতে কর্ম্মে লাগিয়া পড়িতে হইবে। ইহাতেই ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন পুরুষার্থ বা দৈব জয় হইবেই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম আমাকে দুঃখে নিপাতিত করিতেছে—ইহা মূঢ়ের উক্তি মাত্র। ভগবান্ পুরুষকার-রূপে সকলের মধ্যেই আছেন। গীতা বলিতেছেন —"পৌরুষং নৃষু"। পূর্ব্বকর্ম্মফলে যাহা হয় হউক, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঐহিক পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে, নতুবা "পুরুষগর্দ্দভ" হইয়া যাইবে। "আমার অদৃষ্টে ছিল, হইতেছে" ইত্যাকার বুদ্ধিকে জোর করিয়া নিপাতিত করিতে হইবে, ইহাই ভগবান্ বশিষ্ঠের অভিপ্রায়। কারণ, তিনি বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ কর্ম্মের নিকট উপরোক্ত বুদ্ধির প্রাবল্য নাই।

ভগবান্ বশিষ্ঠ, পুরুষকারকেই অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। গীতাও তাহাই বলিতেছেন। "মামেকং শরণং ব্রজ" ইহাই প্রবল পুরুষার্থ। স্বভাব-বশে সংসার করা পুরুষার্থ নহে। উন্মত্ত সাধারণলোকে যাহাকে 'দৈব' বলে তাহাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের পুরুষার্থ মাত্র।

সাধূপদিষ্ট-মার্গেণ যন্মনোঽঙ্গ-বিচেষ্টিতম্।
তৎ পৌরুষং তৎ সফলমন্যদুন্মত্ত চেষ্টিতম্॥

সাধুউপদিষ্ট পন্থা অনুসারে মন, বাক্য ও শরীরের যে চালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার, তাহাই সফল। অন্য পুরুষকার উন্মত্তচেষ্টা মাত্র।

দৈবং পুরুষকারেণ যো নিবর্ত্তিতুমিচ্ছতি।
ইহবাঽমুত্র জগতি স সম্পূর্ণাভিবাঞ্ছিতঃ॥

যিনি পুরুষকার দ্বারা দৈব নিরাকরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ইহ লোক ও পরলোকে সম্পূর্ণ অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়েন।

যে সমুদ্যোগমুৎসৃজ্য স্থিতা দৈব পরায়ণাঃ।
তে ধর্ম্মমর্থং কামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্মবিদ্বিষঃ॥

যাহারা দৈব পরায়ণ হইয়া নিশ্চেষ্ট হয়, সেই আত্ম-বিদ্বেষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ হইতে বঞ্চিত হয়।

এই জগতে যে যেখানে প্রকৃত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে পুরুষার্থ বলেই প্রাপ্ত হইয়াছে।

পুরুষার্থেন দেবানাং, গুরুরেব বৃহস্পতিঃ।
শুক্রোদৈত্যেন্দ্রগুরুতাং, পুরুষার্থেন চাস্থিতঃ॥
দৈন্যদারিদ্র্যদুঃখার্ত্তা, অপি সাধো নরোত্তমাঃ।
পৌরুষে নৈব যত্নেন যাতা দেবেন্দ্রতুল্যতাম্॥

বৃহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগুরু হইয়াছেন, শুক্রাচার্য্য পুরুষকার-বলে দৈত্যগুরু হইয়াছেন। হে সাধো! প্রযত্নশালী কত শত মনুষ্য, দৈন্যদারিদ্র্য দুঃখে পীড়িত হইয়াও পুরুষকারের বলে ইন্দ্রতুল্য হইয়াছেন।

বিশ্বামিত্রেণ মুনিনা দৈবমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
পৌরুষেণৈব সম্প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং রাম নান্যথা॥
অস্মাভিরপরৈ রাম, পুরুষৈ মুনিতাং গতৈঃ।
পৌরুষেণৈব সম্প্রাপ্তা চিরং গগন গামিতা॥

বিশ্বামিত্র মুনি, একমাত্র পুরুষকার-বলেই দৈবকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অন্য কোনপ্রকারে নহে। আমরাও পৌরুষ বলে মুনি হইয়াছি ও এই ত্রিভুবন মধ্যে বহু সময় ব্যাপিয়া আকাশ-গমন করিতে শিখিয়াছি।

উৎসাদ্য দেব-সঙ্ঘাতং চক্রুস্ত্রিভুবনোদরে।
পৌরুষেণৈব যত্নেন সাম্রাজ্যং দানবেশ্বরাঃ॥

দৈত্যগণ পৌরুষবলেই দেবসমূহকে উৎসাদিত করিয়া ত্রিভুবন মধ্যে সাম্রাজ্য করিয়াছে। আবার—

আলূনশীর্ণমাভোগি জগদাজহ্রুরোজসা।
পৌরুষেণৈব যত্নেন দানবেভ্যঃ সুরেশ্বরাঃ॥

দেবগণ পৌরুষবলেই অসুরগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, বিশীর্ণ এবং বিশাল জগৎ আহরণ করিয়াছিলেন।

পৌরুষ অবলম্বন কর, জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, এই জগতের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

যো যো যথা প্রযততে স স তত্তৎ ফলৈকভাক্।
নতু তুষ্ণীং স্থিতেনেহ কেনচিৎ প্রাপ্যতে ফলম্॥

শুভেন পুরুষার্থেন শুভমাসাদ্যতে ফলম্।
অশুভে নাঽশুভং রাম যথেচ্ছসি তথা কুরু॥

যে যে লোক, যেমন যেমন পুরুষার্থ করে, সে সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি ফল লাভ হইবে? শুভ পুরুষকারে শুভ ফল লাভ করা যায়, অশুভ পৌরুষে (উন্মত্ত চেষ্টায়) অশুভ ফল লাভ হয়। হে রাম! তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই করিতে পার।

দৈব কাহাকে বলে, তাহার বিচার না করিয়াই লোকে নানাপ্রকারে বিপদে পড়ে। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

পুরুষার্থাৎ ফল প্রাপ্তির্দেশ কালবশাদিহ।
প্রাপ্তা চিরেণ শীঘ্রং বা যাসৌ দৈবমিতিস্মৃতা॥
ন দৈবং দৃশ্যতে দৃষ্টম্ ন চ লোকান্তরে স্থিতম্।
উক্তং দৈবাভিধানেন স্বর্লোকে কর্ম্মণঃ ফলম্॥

দেশ কাল বশেই পৌরুষবলে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক যে ফল তাহাকেই দৈব বলে। দৈব কিন্তু চক্ষে দেখা যায় না, লোকান্তরেও নাই, স্বর্গে যে কর্ম্মফল ভোগ করা যায় তাহাই দৈব শব্দে কথিত। বশিষ্ঠদেবের মত এই যে—

পুরুষো জায়তে লোকে বর্দ্ধতে জীর্য্যতে পুনঃ।
ন তত্র দৃশ্যতে দৈবং জরা যৌবন বাল্যবৎ॥
অর্থ প্রাপক কার্য্যৈক প্রযত্ন পরতা বুধৈঃ।
প্রোক্তা পৌরুষ শব্দেন সর্ব্ব মাসাদ্যতেঽনয়া॥

পুরুষ এখানে জন্মিতেছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, জরাগ্রস্ত হইতেছে, কিন্তু তথায় জরা যৌবন বাল্যের ন্যায় দৈব্যের প্রত্যক্ষতা ত হয় না।

পরমার্থ সাধক কার্য্যে যত্নপরতাকেই পুরুষার্থ বলে। এই পুরুষার্থেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

সংবিৎস্পন্দ, মনঃস্পন্দ, ইন্দ্রিয়স্পন্দ এই তিনটি পুরুষার্থের স্বরূপ, ইহা হইতেই ফলোদয় হয়। সংবিৎস্পন্দ তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ, মনঃস্পন্দ পুরুষার্থ সাধনেচ্ছা, অঙ্গস্পন্দ—অঙ্গচালনার্থ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞান জন্য শাস্ত্রীয় উপায়ে মন ও শরীর চালাইতে হইবে। ব্যায়ামও শাস্ত্রমত করা আবশ্যক। উপাসনা, পূজা, ঈশ্বরসেবা নিজের ইচ্ছামত করিলে চলিবে না—কারণ নিজের

চিন্তাকে শাস্ত্রচিন্তার দিকে প্রধাবিত করিলেই বুদ্ধির দোষ কাটিয়া যায় নতুবা আপন মনে চিন্তা করিয়া পুস্তক প্রণয়নে কোন ফল নাই। ইহাতেই নানা মত সৃষ্টি হয়, জীবন্মুক্তি এবং প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত তত্ত্বের পথ আবৃত হয়। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

সংবিৎস্পন্দো মনঃ স্পন্দ ঐন্দ্রিয় স্পন্দ এব চ।
এতানি পুরুষার্থস্য রূপাণ্যেভ্যঃ ফলোদয়ঃ॥

এই জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন

যথা সংবেদনং চেতস্তথা তৎস্পন্দমিচ্ছতি।
তথৈব কায়শ্চলতি তথৈব ফল ভোক্তৃতা॥

কি সুন্দর উপদেশ! চিত্তে যেমন যেমন বিষয় স্ফূর্ত্তি হইবে, চিত্তের স্পন্দনও সেইরূপ হইবে, শরীর চেষ্টাও সেইরূপ হইবে, কাজেই ফল ভোগও তদনুরূপ। মন্দ চিন্তা কর, চিত্ত মন্দভাবে স্পন্দিত হইবে, শরীর চেষ্টাও বিকৃত ভাবে চলিবে। কাজেই রোগ শোক আধি ব্যাধি আসিবেই।

আবাল মেতৎ সংসিদ্ধং, যত্র যত্র যথা যথা।
দৈবন্তু ন ক্বচিদ্দৃষ্ট, মতো জগতি পৌরুষম্॥

বাল্যাবধি যে যে বিষয়ে যেরূপ যত্ন করা যায় তাহাই পাওয়া যায়, দৈব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, কেবল মাত্র পৌরুষই বিদ্যমান।

যদি এতদিনও কিছু না করিয়া থাক, এখন হইতে শাস্ত্রমত চলিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাক। তোমার দুরদৃষ্ট দূর হইবে—অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্দ কর্ম্ম, চেষ্টা দ্বারা যে মন্দ স্বভাব বা দুর্দৈব বা কুপুরুষকার হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। কিন্তু উদ্যম কখনও ত্যাগ করিও না তোমার হইবেই। একবার বিফল মনোরথ হইতেছ, দুইবার হইতেছ, কি তিনবার হইতেছ, ইহাতে নিরুৎসাহ হইও না। শাস্ত্র বলিতেছেন, ঠিক শাস্ত্রমত চলিতে থাক, যতক্ষণ না হয় চেষ্টা কর—হইবেই নিশ্চয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—

শাস্ত্রতো গুরুতশ্চৈব, স্বতশ্চেতি ত্রিসিদ্ধয়ঃ।
সর্ব্বত্র পুরুষার্থস্য, ন দৈবস্য কদাচন॥

শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ও নিজের অনুভব, এই তিনের মিলন কর, পুরুষার্থ সিদ্ধি হইবেই; ইহাতে দৈবের কোন প্রয়োজন নাই। বশিষ্ঠদেবের এই

বাক্য যে জাতি গ্রহণ করিবে, সেই জাতি একদিকে জীবন্মুক্তি অন্যদিকে জগতের অভ্যুদয় সম্পাদন করিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

রে পাপী দুর্ব্বল জীব! বশিষ্ঠ বাক্য হৃদয়ে ধারণ কর

"হ্যস্তনী দুষ্ক্রিয়াভ্যেতি শোভাং সৎক্রিয়য়া যথা।
অদ্যৈবং প্রাক্তনী তস্মাৎ যত্নাৎ সৎকার্য্যবান্ ভবেৎ॥"

যেমন, পূর্ব্বতন কুকার্য্য সৎকর্ম্ম দ্বারা বিমল হইয়া শুভে পরিণত হয়, প্রাক্তন কর্ম্মও সেইরূপ শুভে পরিণত হয়। অতএব যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্য, গুরু-বাক্য ও আপন অনুভব মিলাইয়া কার্য্য করিতে থাক। এই তিনটির কোন একটি বাদ দিলে তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী। শুধু গুরুবাক্য যদি শাস্ত্রবাক্যের সহিত না মিলে, তবে গুরু ঈশ্বর পথে চলিতেছেন না নিশ্চয়, আর যদি শাস্ত্র লিখিত শ্লোক সৎগুরু বাক্যের সহিত মিলিত না হয়, তবে উহা শাস্ত্র নহে, মূর্খ লোকের উক্তি মাত্র, কোনরূপে শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই যোগবাশিষ্ঠ, এই গীতা, এই অধ্যাত্ম রামায়ণ, এই মহাভারত, এই ভাগবত, এই চণ্ডী, ইহারা একই উপদেশ দিতেছেন, ইহারা শ্রুতিবাক্য মাত্রই সমর্থন করিতেছেন। যেখানে বিরোধ মত বোধ হয়, সেখানে অগ্র পশ্চাৎ তুমি দেখিতেছ না তাই বিরোধ। অগ্রপশ্চাৎ মিলাইয়া দেখ, দেখিবে ভগবান্ বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ব্যাস, শঙ্কর, এক কথাই বলিতেছেন। ইহাদের বাক্যে অশ্রদ্ধা যিনি করেন, তিনিই জীবের অনিষ্ট করেন। এইজন্য সৎশাস্ত্র ও সদ্গুরু একান্ত আবশ্যক। সৎশাস্ত্রই ঈশ্বর বাক্য, সদ্গুরুই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর আশ্রয় কর "মামেকং শরণং ব্রজ", তুমি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবই শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ দেখিয়া সংশয় সৃষ্টি করে, ইহা ইহাদের বিচারের দোষ! ব্যাসদেব এবং বশিষ্ঠদেব এইরূপে দৈব ও পুরুষকারের সমান্তর করিয়াছেন। প্রকৃত পুরুষকার ঈশ্বর লাভ জন্য চেষ্টা মাত্র। সংসার কার্য্যের চেষ্টাকে পুরুষকার বলে না—ইহা উন্মত্তচেষ্টা মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার জীবের স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছে—এই স্বভাব আপনা হইতে বিষয়ের দিকে চলিবেই, ইহার জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কাম, ক্রোধ, বিষয়-আসক্তি, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য—ইহাদের জন্য কোন চেষ্টার আবশ্যক করে না, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুচেষ্টার ফলে আপনারাই কার্য্য করে। চেষ্টা কেবল ঈশ্বরলাভ জন্যই করিতে হয়—ইহাই পুরুষার্থ। সংসার চেষ্টাই যাহার সর্ব্বস্ব, ঈশ্বরলাভ চেষ্টা সময়ে যে বলে,

"যখন সময় হইবে তখন করিব" সেই রূপ মূঢ়-বুদ্ধি মনুষ্য আপনি ও নষ্ট হয়, অন্যকেও নাশের সদুপদেশ প্রদান করে। ঈশ্বরকে ডাকিবার সামর্থ্য সকল মনুষ্যের সকল কালেই আছে, ইহা আমরা "অপিচেৎসুদুরাচারঃ ইত্যাদি" গীতার শ্লোক হইতে দেখিয়াছি।

বশিষ্ঠদেব আবার বলিতেছেন—

মূঢ়ানুমানসংসিদ্ধং, দৈবং যস্যাস্তি দুর্ম্মতেঃ।
দৈবাদ্দাহোঽস্তি নৈবেতি, গন্তব্যং তেন পাবকে ॥

যে দুর্ম্মতি, মূঢ়ব্যক্তির অনুমান-সিদ্ধ দৈব মানিয়া থাকে, তাহার "অগ্নিতেও দৈবাৎ দগ্ধ হইব না" এই স্থির করিয়া অগ্নিতে পড়া উচিত।

দৈব মেবেহ চেৎ কর্ত্তৃ, পুংসঃ কিমিব চেষ্টয়া।
স্নানদানাসনোচ্চারান্ দৈবমেবং করিষ্যতি ॥
কিংবা শাস্ত্রোপদেশেন, মূকোঽয়ং পুরুষঃ কিল।
সঞ্চার্য্যতে তু দৈবেন, কিং কস্যেহোপদিশ্যতে ॥

এই জগতে দৈবেরই যদি কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? দৈবই কেন স্নান, দান, উপবেশন, মলত্যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম করুক না? শাস্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? দৈবই সকল কর্ম্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক।

এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহা সত্য যে, সকল বিষয়েই যত্নের আতিশয্য থাকিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল প্রকার অভিলষিতই সফল হয়। শুভ উদ্যম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নন্দী, বলি, সম্বর্ত্ত, বিশ্বামিত্র, উপমন্যু, শ্বেতনামক মুনি, পতিব্রতা সাবিত্রী, ইহারা উদ্যমশীল হইয়াই অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। জগতে এমন কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হয় না যিনি অতিশয় শুভ উদ্যোগ করিয়াও ফললাভ করেন নাই। এজন্য আত্মজ্ঞান বিষয়েই দৃঢ় উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান ব্যতীত কদাচ কোন উপায়ে জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহের উপশম হয় না—অন্য কোন উপায়ে জীবন্মুক্তি হইতে পারে না।

শাস্ত্রে যেখানে দৈবের কথা উল্লেখ আছে এবং দৈবের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মূঢ়জনের বুদ্ধি-গ্রাহ্য নিশ্চেষ্টভাব নহে—ইহার নাম মহা-নিয়তি। এই মহানিয়তি ব্রহ্মের চিৎশক্তি। ইহা স্পন্দরূপিণী অবশ্যম্ভাবিনী। এই মহানিয়তি আদি সৃষ্টিকালে পরব্রহ্মের সঙ্কল্পাত্মকবৃত্তিরূপে উদ্রিক্ত হয়।

ঐ মহানিয়তি বলে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জগৎ সমূহ তৃণের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই মহানিয়তি সর্ব্বকালগামী ও সকল বস্তুব্যাপী। ইহার সহিত মোহের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা বিশুদ্ধ ঈশ্বর সঙ্কল্প। এই মহানিয়তিকে জ্ঞানিগণ দৈব নাম দিয়া থাকেন। "এই পদার্থ এই প্রকার স্পন্দিত হইবে, এইরূপে, এই প্রকারে, এই সময়ে, উৎপন্ন হইবে" ইত্যাকার অবশ্যম্ভাবিতাকে দৈব কহে। ইহাকেই পুরুষস্পন্দ, নিখিল তৃণগুল্মাদি, সমুদায় জীব, দিবারাত্র্যাদিকাল ও ক্রিয়া বলা হয়। এই নিয়তিবলে পুরুষাদৃষ্টের সত্তা এবং পুরুষাদৃষ্টদ্বারা এই নিয়তির সত্তা, ত্রিভুবনের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে। তাহার পর মহাপ্রলয় হইলে পুরুষাদৃষ্ট ও এই নিয়তি এক আত্মারূপে অবস্থিত হয়। কল্পারম্ভ হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পুরুষ-ক্রিয়ামূলক যে কিছু ব্যবহার চলিতেছে, তৎসমুদায় এই নিয়তি বশেই হইয়া থাকে। এই অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি দ্বারা যাহা হইবে, তাহা রুদ্র প্রভৃতিগণেরও বুদ্ধিদ্বারা লঙ্ঘনীয় হয় না। অতএব ধীমান্ ব্যক্তি এই নিয়তি আশ্রয় করিয়া পুরুষকার ত্যাগ করিবেন না। কারণ, নিয়তি পুরুষকার আকারেই কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী হয়। এই নিয়তি যখন পুরুষ প্রযত্নে মিলিত না হয়, ঈশ্বর সঙ্কল্প মাত্রেই অবস্থিত হয়, তখন সে নিয়তি পদবাচ্য হয় এবং যখন সৃষ্টি ফল সম্পৃক্ত হয় তখন তাহাকে পুরুষকার কহে; অতএব পুরুষকার রূপে পরিণত না হইলে নিয়তি দ্বারা কোন ফল হয় না। পুরুষকারে পরিণত হইলেই নিয়তি সফল হয়। যে ব্যক্তি নিয়তি আশ্রয় করিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে, তাহার প্রাণবায়ুর স্পন্দ কোথায় যাইবে? অর্থাৎ ক্ষুধাতুর হইলেও, নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করায় যখন কেহ ক্ষণকাল জীবিতও থাকে, তখন তাহারও প্রাণবায়ু সঞ্চালনের অনুকূল যত্ন ও পুরুষকার থাকে। যখন তাহার অভাব হয় তখন তাহারও অভাব হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থলে যে ব্যক্তি প্রাণবায়ুর রোধ করিয়া চিত্ত বিশ্রাম-পদে অবস্থান করে এবং সেই সাধু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ যে সকল পৌরুষের ফল স্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় তাহাও তাহার প্রাণরোধাদিরূপ পুরুষকারের ফল, সুতরাং "পুরুষকার ব্যতীত ফল," ইহা কিরূপে বলা যাইবে? অতএব শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুরুষকার অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। জ্ঞানীদিগের নিয়তিতে কোন দুঃখের লেশ নাই। উহাতে অবিদ্যা নাশ হইয়া থাকে। এই নির্দুঃখ নিয়তিরূপ ব্রহ্মভাবের স্ফুরণে যদি পরিণত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই পরমশুদ্ধ পরমপদ প্রাপ্তি ও পরম গতিলাভ, জানিবে। যেমন জলেরই দ্রবত্ব, তৃণ লতা বৃক্ষ প্রভৃতি রূপে

ধরাতলে স্ফুরিত হয় সেইরূপ সর্ব্বগামী ব্রহ্মই উক্তপ্রকার নিয়তি বিভাগে স্ফুরিত হয়েন। এই কঠিন তত্ত্ব যাহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন; তাহারা যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রকরণের ৬২ অধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।

উপরে দেখান হইল—পুরুষকার বলেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়। মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্ এই যে তিন প্রকার মনুষ্য আছে, তন্মধ্যে মূর্খেরাই পুরুষকার স্বীকার করে না। আর যাহারা পুরুষকার স্বীকার করে, মনে মনে কামনা করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মদ্বারা তাহা সাধন না করে, তাহাদের ব্যবহার উন্মত্তের ক্রীড়া মাত্র।

চিত্তে চিন্তয়তামর্থং যথাশাস্ত্রং নিজেহিতৈঃ।
অসংসাধয়তামেব মূঢ়ানাং ধিগ্‌দুরীস্পিতম্॥

যে সকল মূঢ় মনে মনে কোন অভিলাষ করিয়া যথাশাস্ত্র স্বীয় চেষ্টা দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তাহাদিগের ইষ্ট ভোগ লিপ্সায় ধিক্। ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে "যাতি নিষ্ফল যত্নত্বং ন কদাচন কশ্চন"। শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রযত্ন কখনই নিষ্ফল হয় না, দৈব পরায়ণ সেই সেই ব্যক্তিই দীন হীন পামর ও মূঢ়, যাহারা লোভ পরবশ হইয়া প্রাক্তন কর্ম্মের জয়ার্থ যত্ন করে না। কিন্তু

পৌরুষেণ কৃতং কর্ম্ম দৈবাদ্‌যদভিনশ্যতি।
তত্র নাশয়িতুর্জ্ঞেয়ং পৌরুষং বলবত্তরম্॥

যথায় পুরুষকার-কৃত কর্ম্ম দৈবাৎ বিফল হয় তথায় বুঝিবে সেই কর্ম্মনাশক ব্যক্তির পুরুষকার আরও প্রবল।

যদ্ যদভ্যস্যতে লোকে তন্ময়েনৈব ভূয়তে।
ইত্যাকুমারং প্রাজ্ঞেষু দৃষ্টং সন্দেহবর্জ্জিতম্॥

এই জগতে যাহা অভ্যাস করা যায় তাহাতেই তন্ময় হওয়া যায়—ইহার পরিচয় আবাল বৃদ্ধে জ্ঞাত আছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত গুরু, শাস্ত্র ও অনুভব দ্বারা নির্ণীত কর্ম্ম অভ্যাস কর, হইবেই।

যাহারা জীবনের লক্ষ্য বুঝিয়াও তল্লাভে পৌরুষ প্রদর্শন না করে, তাহারাই প্রকৃত মূর্খ।

বরং শরাব হস্তস্য, চাণ্ডালাগারবীথিষু।
ভিক্ষার্থমটনং রাম. ন মৌর্খ্যহত-জীবিতম॥

বরং শরাব-হস্তে চণ্ডালভবনরথ্যায় ভিক্ষা করিতে যাওয়া ভাল, কিন্তু মূর্খতা-দূষিত জীবন কিছু নহে।

আর মুক্তির পথ জানিয়াও

সম্ভোগাশন মাত্রেণরাজ্যাদিষু সুখেষু যে।
সন্তুষ্টা দুষ্টমনসো বিদ্ধি তানন্ধদর্দ্দুরান্॥

যাহারা রাজ্যাদি সুখসম্ভোগ মাত্রেই সন্তুষ্ট, সেই দুষ্টাধমগণকে অন্ধ ভেক স্বরূপ জানিবে।

অধিক আর কি বলা যাইবে—আত্মদর্শনে সচেষ্ট হও, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হও আর বিলম্ব করিও না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" ইহা স্মরণ রাখিয়া যে পাপী মোক্ষলাভার্থকর্ম্মে ভীত হইয়া ভোগ রসে আসক্ত হয় সেই অধম নিজ মাতার বিষ্ঠার ক্রিমি তুল্য—সেই অধমগণের নাম কীর্ত্তনীয় নহে—

এতাবত্যপি যে ভীতাঃ, পাপা ভোগরসেস্থিতাঃ।
স্বমাতৃবিষ্ঠা ক্রিময়ঃ, কীর্ত্তনীয়া ন তেঽধমাঃ॥

শাস্ত্র শক্তি সঞ্চার করিতেছেন—তুমি আপন লক্ষ্যও স্থির করিয়াছ, এক্ষণে প্রবল পুরুষার্থ সহকারে কর্ম্মে নিযুক্ত হও।

উদ্যম প্রবল রাখিবার জন্য প্রতিদিন বিচার করিও—দেহ নশ্বর, স্ত্র্যাদি ভোগ, কীটের ব্রণাস্বাদন ন্যায়; লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছাচার মত কর্ম্ম, উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র। অন্য কর্ম্ম যখন তোমায় করিতে হয়, তখনও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, মোক্ষ-প্রাপক কর্ম্ম ভিন্ন সকল কর্ম্মই মিথ্যা। মিথ্যা বোধে যদি কখন কোন কর্ম্ম কর, তবে তোমার প্রকৃত কর্ম্মের ক্ষতি হইবে না।

আমরা উপসংহারে এইমাত্র বলি যে শ্রীভগবান্ আশ্রয় দিলেন, তিনি শাস্ত্রমুখে, সাধুমুখে, গুরুমুখে পথ দেখাইয়া দিলেন। জীব! আর তোমার ভয় কি? তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া আনন্দধামে শুভযাত্রা কর। প্রবল উদ্যমে পথ অতিক্রম করিতে থাক', শরীরের দিকে, ভোগের দিকে, আর চাহিও না। কোথাও সন্দেহ হইলে ভগবান্ আত্মাকেই জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমার পথপ্রদর্শক; গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য তাঁহারই বাক্য। তুমি অধ্যবসায় কর, নিশ্চয়ই আনন্দ ধামে যাইতে পারিবে, নিশ্চয়ই এই জন্মেই জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে। ভাবিও না যে এই ঘোর কলিযুগে জীবমুক্তি অসম্ভব কথা—

"সর্ব্ব মেবেহ হি সদা, সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ, পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥"

টীকাকার বলিতেছেন "ননুশুকাদীনাং শমদমাদি সাধন সম্পন্নানাং শ্রবণং ফলিতং কথমন্যেষামাধুনিকানাং তৎ ফলিষ্যতি, সাধনানাং দুঃসম্পাদত্বাদিত্যাশঙ্ক্য পুরুষপ্রযত্নস্যাসাধ্য নাস্তীত্যাহ সর্ব্বমেবেতি।"

ভাগবতাদি শাস্ত্রে এবং অধ্যাত্ম-রামায়ণাদিতেও জীবন্মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত শাস্ত্র কলির জীবেরই জন্য। গীতায় যাহা সূত্র মাত্র, অন্য অন্য শাস্ত্রে তাহার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়; সেই জন্য আমরা এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যেখানেই আসি না কেন, বিনা জীবন্মুক্তিতে কাহারও দুঃখনিবৃত্তি নাই। জীবন্মুক্তি সুখের জন্য, যাহা করিতে হইবে, তাহা উল্লেখ করিয়া এই অংশ শেষ করা গেল।

"পরিস্পন্দঃ শাস্ত্রবিহিত কায়বাক্‌চিত্তচলনরূপং কর্ম্ম তস্য ফলং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানং তৎপ্রাপ্তৌ সত্যাং হৃদি শীতলং কাম ক্রোধাদি সন্তাপাপ্রতিহত মাহ্লাদনং জীবন্মুক্তিসুখমুদেতি। তথাচ শ্রুতিঃ—

স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্যেতি।

স্মৃতিশ্চ—যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চদিব্যং মহৎসুখম্।

তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলামিতি॥

তত্তু সর্ব্বং পৌরুষাদেব ভবতি নান্যত ইতি পুরুষ প্রযত্ন এবনির্ভরঃ কার্য্য ইতি ভাবঃ।" যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার উপরি উক্ত কথা বলিতেছেন তাহা এই—

ইহ হীন্দোরিবোদেতি শীতলাহ্লাদনং হৃদি।

পরিস্পন্দ ফল প্রাপ্তৌ পৌরুষাদেব নান্যতঃ॥

শীতল কাম ক্রোধাদি সন্তাপ অপ্রতিহত যে আহ্লাদকে জীবন্মুক্তি বলে, জীব সেই জীবন্মুক্তির জন্য পুরুষার্থ না করিয়া কোন্ ভূতের কার্য্যে জীবন ব্যয় করিতেছে? আর বিলম্ব করিও না "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"।

তৃতীয় কথা

গীতার স্থূল পরিচয়।

১। ভগবান্ ব্যাসদেব শত সহস্র (১০০×১০০০) বা লক্ষ শ্লোকে মহাভারত রচনা করিয়াছেন। অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী গীতা মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের অংশ। ৭০০ শ্লোকে গীতা গ্রথিত। এই ৭০০ শ্লোকের মধ্যে একটী শ্লোক ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি, ৪০টি সঞ্জয়ের, ৮৪টি শ্লোক অর্জ্জুনের, এবং ৫৭৫ বা ৫৭৬টি ভগবানের মুখপদ্মবিনিঃসৃত। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহা বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে "ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে" ইত্যাদি। গীতার স্থূল পরিচয় গীতাই দিতেছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ, ইহা যোগশাস্ত্র, ইহা ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা উপনিষদ্।

২। গীতা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ। গীতার শেষ কয়েকটী শ্লোকে সঞ্জয় এই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।
ব্যাস প্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥

গীতার অদ্ভুত সংবাদ, গীতার অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ—কখনও কি স্মরণ করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক' সাধনায় বসিবার পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইও, দেখিবে—স্মরণে চিত্ত কোন্ ভূমিকায় উপস্থিত হয়!

সঞ্জয় বলিতেছেন—আমি মহাত্মা পার্থ ও বাসুদেবের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ

সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্ সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণ এই পরমগুহ্য যোগ কহিলেন, আমি ব্যাস প্রসাদে শ্রবণ করিলাম। কেশবার্জ্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। হে রাজন্ শ্রীহরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণ হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ হর্ষ লাভ করিতেছি।

সত্যই কি এক অদ্ভুত লোমহর্ষণ ব্যাপার এই কৃষ্ণার্জ্জুন কথায় সন্নিবেশিত, কি এক অদ্ভুত বিশ্বরূপ এই গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত!! যদি এই অদ্ভুত সংবাদ, এই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে, যদি ইহার স্মরণে মুহুর্মুহুঃ হর্ষ না আইসে তবে গীতা পরিচয়ে ফল কি?

সঞ্জয়ের ত মুহুর্মুহুঃ হর্ষ আসিয়াছিল, আমাদের আসে না কেন? কারণ আছে। পুস্তকে উপদেষ্টার স্বর আঁকা থাকে না, সে স্নেহদৃষ্টি থাকে না, সে মধুর হাস্য থাকে না, সে সুন্দর হস্তভঙ্গী থাকে না। নির্জীব গ্রন্থ কথাগুলি মাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখে; যাহার কথা, সে যেমন করিয়া বলিয়া ছিল, পুস্তক সে প্রকারটি দিতে পারে না। কিন্তু যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন, সেই হাসি, সেই ভঙ্গী, সেই ত্রিভঙ্গললাম ঠাম, সেই স্নেহভরা চাহনি, সেই অঙ্গুলি-সঙ্কেত, যে ভক্ত আপন মানসচক্ষে সেই ভরা-রূপের আভাসও প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই ধন্য! তিনিই সেই বিশ্বরূপ স্মরণে সেই রূপজড়িত বাক্যে পুনঃ পুনঃ হর্ষ লাভ করেন। এ হর্ষ অন্তরের অন্তস্তলে অনুভূত হয়, এ আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চ হয়, চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হয়, স্বর গদ্‌গদ্ হইয়া যায়, কতই সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়। গীতার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে এই সাত্ত্বিক বিকার যদি প্রকটিত না হয়, তবে গীতার অনুভূতি যেন ঠিক হয় না। কোন কিছু গ্রহণ করিয়া যদি রসে উপস্থিত না হওয়া যায় তবে বুদ্ধির ক্ষণিক তৃপ্তি বা চিত্তবিনোদন পর্য্যন্তই লাভ হয়। ভগবানের রূপের সহিত ভগবদ্ বাক্য স্মরণ কর, আনন্দ আসিবেই।

এই অদ্ভুত বিশ্বরূপ, এই লোমহর্ষণ সংবাদ লইয়াই গীতা। বিশ্বরূপ, গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত—ইহা বলিবার কথা নহে, অনুভবের কথা। সংবাদের পরিচয় আবশ্যক।

৩। গীতা যোগ শাস্ত্র। ইহার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ প্রকার যোগের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ যোগ এবং শেষ অধ্যায়ে মোক্ষ যোগ। যিনি বিষাদকে যোগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই গীতোক্ত

পথে কার্য্য করিয়া সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভে সমর্থ।

এই অষ্টাদশ যোগ, তিন ষট্‌কে বিভক্ত। প্রথম ষট্‌কে বিষাদ যোগ, সাংখ্য যোগ, কর্ম্ম যোগ, জ্ঞান যোগ এবং ধ্যান যোগ। দ্বিতীয় ষট্‌কে বিজ্ঞান যোগ, অক্ষর ব্রহ্মযোগ, রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ, বিভূতি যোগ, বিশ্বরূপ দর্শন এবং ভক্তি যোগ। শেষ ষট্‌কে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ, গুণত্রয় বিভাগ যোগ, পুরুষোত্তম যোগ, দৈবাসুর সম্পদ্বিভাগ যোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ এবং মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ। প্রতি ষট্‌কেই কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান উল্লেখ থাকিলেও প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রতি ষট্‌কেই পরোক্ষ জ্ঞান, সাধনা ও সিদ্ধাবস্থা বর্ণিত। বেদ যেরূপ কর্ম্ম কাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড, ও জ্ঞান কাণ্ডে বিভক্ত, গীতাও তাহাই। ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রম, কাণ্ডে কাণ্ডে ক্রম, শ্লোকে শ্লোকে ক্রম, এমন কি শ্লোকের শব্দে শব্দে ক্রম লক্ষিত হয়। শ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয়ে এই ক্রম বুঝিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। অদ্ভুত গ্রন্থ এই গীতা! ধর্ম্মময়ী সর্ব্বশাস্ত্র সারভূতা বিশুদ্ধা এই গীতা এই জন্যই এত আদরের বস্তু। গীতা বহু ভাষায় অনূদিত, বহুভাষ্যে অলঙ্কৃত, জগন্মান্য বহু পণ্ডিত আজও ইহার পূজা করেন। গুণ না থাকিলে এত আদর কি হয়? আর—

সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতা নাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥

৪। গীতা ব্রহ্মবিদ্যা। যে বিদ্যার প্রকাশে আপন স্বরূপ অনুভূত হয় তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। যাহারা অবিদ্যার বশবর্ত্তী তাহারা প্রবৃত্তি মার্গ নিরত, আর যাঁহারা বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা "নিবৃত্তিমার্গ নিরতা বেদান্তার্থ-বিচারকাঃ। তদ্ভক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ।" যাঁহারা বেদান্তার্থ-বিচারক, যাঁহারা ভগবানের ভক্ত তাঁহারাই নিবৃত্তিমার্গ নিরত। ইহারাই বিদ্যালাভে সমর্থ। পরমানন্দে নিত্যস্থিতি, ব্রহ্মবিদ্যাই কেবল প্রদান করিতে পারেন। এই পরমানন্দরূপে নিত্যস্থিতিই কৈবল্যমুক্তি। ব্রহ্মবিদ্যার অন্য নাম উপনিষদ্ বিদ্যা। মুমুক্ষুগণকে মুক্তি প্রদান করিতে এক একখানি উপনিষদ্‌ই সমর্থ—

মাণ্ডুক্য মেকমেবালং, মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে।
তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্ জ্ঞানং, দশোপনিষদং পঠ।

গীতা, সমস্ত উপনিষদের সার—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

৫। গীতা উপনিষদ্ কেন? 'উপনিষদ্' অর্থে সমীপসদনম্ (উপ + নি + সদ্ + ক্বিপ্)। 'উপ' অর্থে সমীপে, 'নি' অর্থে নিশ্চয়রূপে, 'সদ্' অর্থে অবস্থান —নিশ্চয়রূপে সমীপে অবস্থান, ইহাই উপনিষদের ধাতুগত অর্থ। যে বিদ্যা "তিনি অতি সমীপে অবস্থান করিতেছেন" ইহা নিশ্চয়রূপে অনুভব করাইয়া দেয় তাহাই উপনিষদ্ বিদ্যা, ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা।

কে সমীপে অবস্থান করিতেছেন? যিনি সর্ব্বপ্রকার বিষাদের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বরূপ, যিনি চিরস্থায়ী আনন্দ-স্বরূপ, যাঁহাকে জানিলে—দেখিলে তাহাই হইয়া যাওয়া যায়, সেই সচ্চিদানন্দরূপী; সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তাই সমীপে। ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ভগবান্, ইনিই পরমাত্মা। গীতা এই আত্মজ্ঞান প্রদান করিতেছেন বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে—ইহাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে।

এই ব্রহ্মবিদ্যা, এই উপনিষদ্, এই যোগশাস্ত্র লইয়াই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ। গীতার লক্ষ্যসঙ্কেত ও কর্ম্মসঙ্কেতে এই সংবাদের পরিচয় দেওয়া হইবে। গীতার স্থান, কাল ও পাত্র বিবৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন চরিত্রের কতক আলোচনা করা যাইবে।

চতুর্থ কথা।

গীতায় লক্ষ্য সঙ্কেত।

জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স—ইহাই গীতার লক্ষ্য। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এই দুইটি শাস্ত্রীয় বাক্য। অভ্যুদয় অর্থে প্রকৃত আনন্দের দিকে জগতের উন্নতি, এবং নিঃশ্রেয়স অর্থে পরমানন্দে নিত্যস্থিতি, বা মুক্তি। জীব একদিকে জগচ্চক্র আনন্দপথে পরিচালিত করিবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবে—ইহাই গীতার লক্ষ্য।

মহাপুরুষের লক্ষ্য সর্ব্বদাই জ্বলন্তভাবে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে। লক্ষ্যই সর্ব্বদা তাঁহাকে আকর্ষণ করে। মানব জাতির দুঃখ নিবারণ যাঁহার লক্ষ্য, তিনি ক্ষুদ্র সংসার মমত্বে অভিভূত হইতে পারেন না। হৃদয় অন্ধ, বুদ্ধি পথ-প্রদর্শিকা। মহাপুরুষ যদি কখন আপন সতী স্ত্রীর যাতনা বা সদ্যোজাত শিশুর ভবিষ্যৎ দুঃখ ভাবিয়া কাতর হয়েন—কাতর হইয়া আপন ক্ষুদ্র সংসার মায়ায় যদি কখন জগতের দুঃখ দূর করিবার সঙ্কল্প শিথিল করেন, তখন সমস্ত প্রকৃতি তাঁহাকে উত্তেজিত করে, আকাশে নক্ষত্র ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে জগতের দুঃখ দেখাইয়া দেয়। তাঁহার ক্ষণিক অন্ধ হৃদয়, তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মতী বুদ্ধির হস্ত ধারণ করে, তিনি তৎক্ষণাৎ আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়েন।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এককালে আচরণ করিবার জন্য গীতা উপদেশ করিতেছেন। নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার সাধন মার্গের বিশেষত্ব। যথাস্থানে ইহা আলোচিত হইয়াছে। এখানে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ম্মভাগ, জগতের অভ্যুদয় জন্য এবং নিষ্কামভাব, জীবের নিঃশ্রেয়স জন্য। বিনা কর্ম্মে জগতের উন্নতি অসম্ভব, বিনা কামনাত্যাগে জীবের পরমানন্দে স্থিতি সুদূরপরাহত। শাস্ত্র বলেন—

যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে॥
নিঃসঙ্কল্পো যথাপ্রাপ্ত ব্যবহার পরোভব।
ক্ষয়ে সঙ্কল্প জালস্য জীবোব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥ অঃ রাঃ, উঃ

জগতের অভ্যুদয় ও মানবের নিঃশ্রেয়স এই প্রবন্ধে, আলোচনার বিষয়। প্রথমে জগতের উন্নতির কথা আলোচনা করা যাউক।

জগচ্চক্র পরিচালন জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। গীতা এই জগচ্চক্রের কথা তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪।১৫ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। পরে বলিতেছেন—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

"মৎপ্রবর্ত্তিত জগচ্চক্রের যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তী না হয় অর্থাৎ জগচ্চক্র পরিচালন জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান যে ব্যক্তি না করে, তাহার আয়ু পাপস্বরূপ। হে পার্থ! এতাদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় উপভোগেই আরাম পায়, সুতরাং তাহার জীবন বৃথা।"

মনুষ্যের বুদ্ধি অল্প। কোন্ কর্ম্মে জগতের ইষ্ট বা অনিষ্ট হইবে, কোন্

কর্ম্মে জগতের জীব সকলে সুখী হইবে, সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে ইহা নিশ্চয় হয় না, এই জন্য, ভগবান্ কর্ম্মের সহিত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবতার সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধও আছে। মনুষ্য কর্ম্মদ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবে, এবং দেবতাগণও বৃষ্ট্যাদি দ্বারা অন্ন উৎপাদন করিয়া মনুষ্যকে বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে দেবতা ও মনুষ্য পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

কিন্তু জগতের উন্নতি কতদূর সম্ভব? সমস্ত জগতের দুঃখ নিবৃত্তি ও সর্ব্ব প্রাণীর পরমানন্দ প্রাপ্তি—ইহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ইহা কখনও হয় নাই, হইতেও পারে না। জগৎ যে কোনও সময়ে সম্পূর্ণ দুঃখশূন্য হইয়াছিল কোন জাতির ইতিহাসেও ইহা দেখা যায় না। আবহমান কাল হইতে বহু জ্ঞানী জগৎকে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সর্ব্ব প্রাণীর দুঃখনিবৃত্তি কি কখনও হইয়াছে? ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন—কিন্তু সকল প্রাণীকে তিনি সাধু করিয়া দিয়া যান না। তিনি, সাধুর বিঘ্ন-বিনাশ করেন, সাধুদিগকে নিরাপদ করেন—কিন্তু অসাধুও থাকে। সত্য যুগেও অসুর ছিল, স্বর্গেও দৈত্য আছে, রামরাজ্যেও রাক্ষসের দৌরাত্ম্য ছিল, যুধিষ্ঠিরকেও ভ্রাতৃবিরোধে বিব্রত হইতে হইয়াছিল, আর কলির ত কথাই নাই। যতদিন জগত থাকিবে ততদিন পাপপুণ্য উভয়ই থাকিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই চলিবে।

জগতের পূর্ণ সুখের অবস্থা তখন, যখন তত্ত্বজ্ঞানী, সর্ব্বভূতহিতৈষী, হিংসা-লোভন-পরিশূন্য ব্যক্তির উপদেশে মানব জাতি চালিত হয়। যখন অজ্ঞানী ভূত-প্রপীড়ক, হিংসা-লোভ-বিশিষ্ট, "আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"-প্রতিপাদনকারী নৃপতিগণ বা ধর্ম্মরক্ষকগণ বা সমাজ-সংস্কারকগণ মানব জাতির শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হয়েন, তখনই জগতের দুঃখের অবস্থা। জগতের সুখের অবস্থা তখন, যখন পুণ্যের ভয়ে পাপ অন্ধকারে থাকে, জ্ঞানীর ভয়ে অজ্ঞানী দমিত থাকে, যখন সদাচারের প্রাবল্যে কদাচার প্রভুত্ব করিতে পায় না, যখন ধর্ম্মের প্রতাপে ধর্ম্মধ্বজিগণ লুক্কায়িত হয়, যখন সতীর তেজে অসতী আর দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না, যখন সতের দৃষ্টান্তে অসৎ আপন পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু যখন রাজা বা ধর্ম্মরক্ষক বা সমাজরক্ষক অদূরদর্শী, আত্মসুখান্বেষী আত্মগরিমা ঘোষণে ব্যস্ত, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়েন; যখন ইঁহারা অহঙ্কারী

ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন; যখন ইহাদের কুকার্য্যের দৃষ্টান্তে দুষ্টলোকের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মভীরু লোকের সুবিধা হ্রাস হয়; কপটব্যবহার ব্যতীত সংসার চলে না, সরল ব্যবহারে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না; যখন অসাধু কপটী প্রতারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সাধু সরল ব্যক্তি পদে পদে উৎপীড়িত হয়েন; যখন এক কথায় ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন যিনি সাধুর সাধু, রক্ষকের রক্ষক তিনি আত্মপ্রকাশ করেন—তখন ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন। ভগবান্ ধর্ম্ম-বিঘ্ন দূর করেন—সাধু-হৃদয়ে সনাতন ধর্ম্ম উজ্জ্বল কৌস্তুভমণির মত জ্বলিতে থাকে; সেই কৌস্তুভালোকে অন্ধকার দূরীভূত হয়, অত্যাচার অন্তর্হিত হয়—ইহাই জগতের রক্ষা, ইহাই জগতের অভ্যুদয়। যখন বহুলোকে অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, যখন অধিকাংশ লোকেই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকে, তখনই জগতের প্রকৃত সুখের অবস্থা। ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ জগতে হয় না।

কিন্তু মানুষের নিঃশ্রেয়স? মনুষ্য পৌরুষ সহকারে যত্ন করিলে সীমাশূন্য আনন্দলাভ করিতে পারে, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিতে পারে। মনুষ্য, জীবন্মুক্তির অধিকারী। মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে—যে, যত্ন করিবে সেই পরমানন্দ লাভ করিবে। এই আনন্দই সকল বস্তুর জীবন। আনন্দের অভাবেই জীবের বিকৃতি। আনন্দের অভাব হইলে কাহারও স্বাভাবিক পরিপুষ্টি হইতে পারে না, জীব ক্রমে শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। জীবের প্রয়োজন একমাত্র আনন্দ। আনন্দে চিরস্থিতির নাম মুক্তি; ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি। গীতার প্রথমে বিষাদ যোগ, শেষে মুক্তিযোগ বা সন্ন্যাসযোগ।

উন্নতির তারতম্যানুসারে উচ্চ নিম্ন শ্রেণীর আনন্দ প্রাপ্তিতে জীবের রুচি দেখা যায়। সর্ব্বোন্নত জীবের লক্ষ্য, নিত্যানন্দ প্রাপ্তি, ইতর জীব, ক্ষণিক সুখেরই প্রয়াস করে।

ব্যবহারিক জগতের আনন্দ অস্থায়ী। ব্যবহারিক জগতের আনন্দ, ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ হয়। প্রবল ইন্দ্রিয় সুখে একটা সুখের মোহ আইসে। সেই সুখের অবস্থায় জীবের জ্ঞান পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হয়। উৎকট সুখে জীব ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ভোগের জন্য কোন ইন্দ্রিয় নাই। সকল ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে সজ্ঞানে এই আনন্দ রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়! ধর্ম্ম-জগৎ এই আনন্দের সংবাদ দেয়। গীতা জীবকে এই আনন্দ ধামে লইয়া যাইতেছেন।

নিত্য আনন্দে জীবের স্থিতি সম্ভব কি অসম্ভব এস্থানে ইহার বিচার অনাবশ্যক। বেদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। তিনি নিত্য, তিনিই

জ্ঞান, তিনিই আনন্দ। নিত্য জ্ঞান ও আনন্দ যিনি, তিনিই ব্রহ্ম। শুদ্ধ আনন্দই যে নিত্য আর কিছুই নিত্য নহে, তাহা নহে; জ্ঞানও নিত্য। জ্ঞান ও আনন্দ চির-সম্মিলিত। জীব এই নিত্য আনন্দ পাইলেই জরা মরণ অতিক্রম করিতে পারে।

কেহ বলেন কর্ম্মেই আনন্দ, কেহ বলেন যোগেই আনন্দ, কেহ বলেন ভক্তিতেই আনন্দ, আর কেহ বলেন জ্ঞানেই আনন্দ। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা বলেন কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান ইহারা পরে পরে আনন্দ প্রাপ্তির ক্রম বটে। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান ভিন্ন পূর্ণপ্রেম সম্ভবে না। মহাদেব, বশিষ্ঠ, নারদাদি পূর্ণজ্ঞানীই পূর্ণপ্রেমিক। প্রেমের আরম্ভ বিশ্বাসে, এবং সমাপ্তি জ্ঞানে। পরমেশ্বরই পরম প্রেমস্বরূপ, পরম জ্ঞানস্বরূপ। গীতা জ্ঞান লাভের ক্রম দেখাইতেছেন। বিশ্বাসীর প্রথম কার্য্য নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা, দ্বিতীয় কর্ম্ম আত্মসংস্থ যোগানন্দ, তৃতীয় কর্ম্ম ভজনানন্দ, এবং সর্ব্বশেষে জ্ঞান। জ্ঞানেই স্বরূপে স্থিতি। নিষ্কাম কর্ম্ম বা উপাসনা, যোগ, ভক্তি, ও জ্ঞান ইহাই গীতার পথ। বেদে যেমন কর্ম্মকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ড, ও জ্ঞানকাণ্ড আছে গীতাও সেইরূপ কাণ্ডত্রয় ভেদে 'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যা মাত্র।

"যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"

যাহা লাভ করিলে সকলই লাভ হয় অন্য লাভ-ইচ্ছা থাকে না—গীতা বলেন মনুষ্য এই অবস্থা লাভ করুক। ইহারই জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি। কিন্তু আরম্ভ করিতে হইবে, কর্ম্ম হইতে।

সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্॥

"সৃষ্টির প্রারম্ভে, ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাসৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন—এই কর্ম্মদ্বারা তোমরা ক্রমোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্টভোগপ্রদ হউক।" কর্ম্ম সঙ্কেতে আমরা কর্ম্মের সঙ্কেত, ক্রম অনুসারে দেখাইব।

নিষ্কাম কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান মনুষ্যকে সীমাশূন্য সুখের অবস্থা প্রদান করে। "এই অবস্থা পাইব" এই আশায় বিশ্বাসীর চিত্ত প্রলুব্ধ হয়। এই নিত্য আনন্দধামে গমন করিলে দেহ শীতে উষ্ণে পীড়িত হয় না, প্রাণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অভিভূত হয় না, মন সুখেদুঃখে, লাভালাভে, জয়পরাজয়ে, মানাপমানে, কিছুতেই চঞ্চল হয় না। এই অবস্থায় বুদ্ধি অজ্ঞানের হস্তে বিড়ম্বিত

হয় না; বিচারোজ্জ্বলা বুদ্ধি, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বুঝিতে পারে, কার্য্য ও অকার্য্য দেখিতে পায়; নশ্বর বিষয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সেই নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকিতে ভালবাসে; সর্ব্বদা সর্ব্বদেশে সর্ব্ব বস্তু মধ্যে যেন কাহারও প্রকাশ দেখিতে পায়, সর্ব্ব ব্যাপারে যেন কাহারও খেলা দেখিতে পায়; জড়প্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই দেখিতে পায় কে ইহাদের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন; এই অবস্থায় হৃদয় সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হইতে থাকে। ক্রমে জগৎ আনন্দময় হইয়া যায়। এই সীমাশূন্য আনন্দ; গীতার লক্ষ্য।

গীতা তিন ষট্‌কে বিভক্ত। এই তিন ষট্‌কে আমরা আত্মসংস্থ যোগী, ভগবন্নামরূপ-ভাবানুরাগী ভক্ত, এবং ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর সাধনা ও প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের প্রতিকৃতি, মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তের সহাস্যমূর্ত্তি এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে পরম জ্ঞানীর শান্তমূর্ত্তি, গীতার লক্ষ্য সুস্পষ্ট করিতেছে।

যে সমস্ত শ্লোকে যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানীর অবস্থা প্রকাশিত, তাহা নিত্য পাঠ করা আবশ্যক। লক্ষ্য স্থির থাকিলেই কর্ম্মোদ্যম শিথিল হয় না। আমরা পূর্ব্বোক্ত অবস্থাজ্ঞাপক কতকগুলি শ্লোক একত্র করিলাম। এগুলি কণ্ঠস্থ করিলেও বহু উপকার হয়।

যোগী দুই প্রকার—ব্যুত্থিত যোগী ও সমাধিস্থ যোগী। অহংকার জন্মিলেই সাধক ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যদি তুমি যোগী অভিমান করিয়া থাক, তবে নিত্য বিচার করিয়া দেখিও গীতোক্ত যোগীর অবস্থা তোমার কতদূর লাভ হইয়াছে। গীতা বলিতেছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

এইরূপ ব্যুত্থিত যোগী কিন্তু নিষ্কর্ম্মা নহেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

আবার বলিতেছেন—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম সঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
যদৃচ্ছা লাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥

তাই বলিতেছিলাম—যখন শুনি এরূপ অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানুষ আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকে; দুঃখেও উদ্বেগ নাই, সুখেও স্পৃহা নাই; যে অবস্থায় রাগ, ভয়, ক্রোধ কিছুই নাই, শুভ আসুক বা অশুভ আসুক কোন চঞ্চলতা নাই; যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় সুখস্বরূপ ঈশ্বরে রমণ করে—আর রাগ দ্বেষশূন্য আত্ম-বশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ হইলেও কখন অশান্তি আইসে না; সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও ঈশ্বর হইতে মন ক্ষণকালের জন্য সরিয়া আইসে না;—যখন শুনি "পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্শ্বসন্, প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি, ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্"—সমস্ত কার্য্য করিয়াও ব্রহ্মে অবস্থিত থাকা যায়, আর যে অবস্থা লাভ করিলে গুরুদুঃখও বিচলিত করিতে পারে না—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে॥

তখন কা'র না ইচ্ছা হয় এই অবস্থা লাভ করি ?

গীতায় আত্মসংস্থকে যোগী বলা হইয়াছে। এই যোগী, তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু আত্মসংস্থ অবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত দৃঢ় না হয় ততদিন চিত্ত স্থির ভাবে আত্মস্থ থাকে না। চিত্ত আত্ম-রস আস্বাদন না করিলে কখনও স্থায়ী ভাবে আত্মসংস্থ হইতে পারে না। এজন্য যোগীকে ভক্ত হইতে হইবে।

যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মন্।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

যে যোগী অনুরাগে ঈশ্বর ভজনা করেন সেই ভক্ত যোগী সর্ব্বযোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মধ্য ষট্‌ক। এই মধ্য ষট্‌কে আমরা আমরা ভক্তের চিত্র দেখি। এখানেও দেখি ভগবান উপদেশ করিতেছেন কিরূপে ভক্ত হওয়া যায়, ভক্তির সাধনা কি এবং ভক্তের অবস্থা কি—অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞান সাধনা ও অপরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থা ভগবান বর্ণনা করিয়াছেন। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান সম্বন্ধে গীতা পরোক্ষজ্ঞান সাধনা ও অপরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ভক্তের সহাস্য মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য আমরা গীতা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখ সুখক্ষমী॥

ভক্ত ভগবানের বড়ই প্রিয়। ভগবান্ বলিতেছেন—

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যাতত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

যোগী হও বা ভক্ত হও উভয়কেই এক অবস্থা লাভ করিতে হইবে। আত্মসংস্থ যোগী পরিপক্কাবস্থাতে ভক্ত। এতদ্ব্যতীত গীতা জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছেন। ইহা গুণাতীতের অবস্থা।

গীতা বলিতেছেন ঃ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
নদ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যোন বিচাল্যতে।
গুণাবর্ত্তন্তইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥
সমদুঃখসুখঃস্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য-প্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তুল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারি পক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী-গুণাতীতঃ সউচ্যতে ॥
মাঞ্চয্যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মমৃতস্যাব্যয়স্যচ।
শাশ্বতস্যচ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্যচ ॥

গীতার শেষ লক্ষ্য এই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গীতা পরম জ্ঞান ও পরাভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির পরে পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞানে ব্রহ্মে অবস্থান, তৎপরে পরাভক্তি।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নশোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

এই পরাভক্তিদ্বারা তত্ত্বের সহিত ভগবানকে জানা যায়। এই তত্ত্বজ্ঞানে

জীব ব্রহ্মের একতা অনুভূত হয়, ইহাই জীবন্মুক্তি, জীবন্মুক্তিই গীতার লক্ষ্য। আবার বলি—অষ্টাদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস মোক্ষ-যোগ।

লক্ষ্য সঙ্কেতের উপসংহারে আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়টী গুটাইয়া সম্মুখে ধরিব—গীতা কি এক আনন্দ মন্দির দেখাইতেছেন! ঐ আনন্দ মন্দিরের চারি পার্শ্বে আনন্দ কুঞ্জ—কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দময় তরুলতা কি এক আনন্দের হিল্লোলে নাচিতেছে, আনন্দ-লতায় আনন্দ-কুসুম, প্রতি আনন্দ-কুসুমে আনন্দময় ভ্রমর সদানন্দে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে গুঞ্জন করিতেছে! এই আনন্দ মন্দিরে উপস্থিত হইলে মানুষ রোগ শোকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায়, রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হয়, শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভালাভ, জঠর ভরণ, পরিবার পোষণ, সমাজ শাসন, রাজ্য পালন, কিছুতেই জীবকে চঞ্চল করিতে পারে না, গীতার লক্ষ্য সেই আনন্দধাম। সেখানে দেহ নীরোগ, মন রাগ-দ্বেষ শূন্য, জীব অজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় সর্ব্বদা বিহার করেন—সেখানে মিলন-বিচ্ছেদের হর্ষ-বিষাদ নাই, সেখানে জনন-মরণের বিভীষিকা নাই, সেখানে আনন্দের ক্ষণিকত্ব নাই—যেখানে নিত্যানন্দ বিরাজমান, গীতার লক্ষ্য সেই স্থান। সেখানে আত্মা কি, জগদাড়ম্বর কেন, মানবের কর্ত্তব্য কি, এতদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই, যে অবস্থায় কোনপ্রকার অজ্ঞান নাই, সেই অবস্থাই গীতার লক্ষ্য। ঋতুর পরিবর্ত্তন, চন্দ্র সূর্য্যের গমনাগমন, মহাভূতগণের পরস্পর আক্রমণ—যেখানে কোনপ্রকার চলন নাই, যেখানে প্রকৃতি আপন গুণে কর্ম্ম করিলেও আত্মার কোন বন্ধন হয় না, গীতা সর্ব্ব মনুষ্যের জন্য সেই আনন্দ মন্দির লক্ষ্য করিয়াছেন। তুমি পাপী হও তাপী হও, দুরাচার হও কুৎসিত কর্ম্মা হও, তুমি ধার্ম্মিক হও বা অধার্ম্মিক হও, গীতার লক্ষ্যে লক্ষ্য স্থাপন কর —গীতার কর্ম্ম অভ্যাস কর, তোমার সর্ব্ব অপরাধের ক্ষমা হইবে, তোমার সর্ব্ব ভয় দূর হইবে - যদি দেহ মন জীর্ণও হইয়া থাকে, যদি শেষ সময়ও উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি গীতা তোমায় নিরাশ করেন না, বলিতেছেন—"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্" বলিতেছেন—"অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ" যদি সকল অপেক্ষাও অধিক পাপী তুমি হও—আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দিব। বলেন—যখন সকলে তোমায় পরিত্যাগ করিবে, তখনও সে তোমায় পরিত্যাগ করিবে না, যদি দেহত্যাগও করিতে হয়, তথাপি দেখিবে সেই সুন্দর ভগবান্ তোমার হস্ত ধরিয়া আপন আনন্দ ধাম, মুক্তি মণ্ডপে লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে

কি আর মৃত্যুতে দুঃখ থাকে ?—সে মরণ ত সুখের, যে মরণে তোমার ভগবান্ তোমার পুরাতন দেহ ত্যাগ করাইয়া নূতন দেহ পরাইয়া দিবেন, তুমি জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্রে নূতন অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। অজ্ঞান আর তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। কখনও তোমার নিরানন্দ আসিবে না, কখনও তুমি অনিত্য বিভীষিকায় ব্যাকুল হইবে না. ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসবান্ হও ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসবতী হও, অগ্রে ভগবানের হও, দেখিবে—ভগবান্ চিরদিনই তোমার রহিয়াছেন।

গীতা বড়ই আশ্বাসদায়িনী! তুমি অজ্ঞানে দেখিতে পাওনা, ভগবান্ তোমায় কত স্নেহ করেন, ভগবানের স্নেহ অনুভব কর আপনিই ভক্ত হইয়া যাইবে। আরও লক্ষ্য কর—ভগবান্ অপেক্ষা ভক্ত কে আছে ? কেহ অপরাধ করিলে সেই অপরাধী তোমার চক্ষুঃশূল হয়, সে নিকটে আসিলে তুমি বিরক্ত হও ; আর ভগবান্—তুমি তাঁহাকে কত অভক্তি কর, কত অবিশ্বাস কর, তাঁহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত তোমার সন্দেহ, তথাপি তিনি একক্ষণকালও তোমায় ছাড়িয়া নাই, সর্ব্বদা তিনি তোমার সেবায় ব্যস্ত, তুমি ইহা অনুভব কর তাঁহার ভক্ত হইয়া যাইবে।

কোন্ কর্ম্মদ্বারা গীতোক্ত আনন্দের অবস্থা লাভ করা যায়, আমরা এক্ষণে তাহার এক অংশের আলোচনা করিব। কর্ম্ম সঙ্কেত আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলিয়া রাখি, আধুনিক সময়ের সহিত প্রাচীন কালের কথঞ্চিৎ তারতম্য দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালে আত্ম-রক্ষাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য, আত্ম-রক্ষার জন্য যে নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা প্রথমেই করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগদ্ রক্ষা হইত। প্রকৃতপক্ষে জীবন্মুক্তভিন্ন যথার্থ জগদ্ রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ নহে। উপস্থিত সময়ে জগদ্ রক্ষাই প্রথম, আত্মরক্ষা একরূপ নাই, আত্ম রক্ষার জন্য কর্ম্মে লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই, এই ক্রমবিপর্য্যয়ে বহুলোক জগতের জন্য কর্ম্ম করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া অকালে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন এবং অল্পকালেই তাঁহাদিগের প্রদত্ত শক্তি জগৎ হইতে অপসারিত হইতেছে। এই জন্য জগতের স্থায়ী উন্নতি হইতেছে না। জীব গীতার উপদেশ লাভ করিয়া আত্ম রক্ষার সহিত জগদ্ রক্ষার কর্ম্ম করুক—নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করুক, তাঁহার কর্ম্মে জগৎ অভ্যুদয় পথে ছুটিবে, জীব আপনিও কামনা শূন্য হইতেছে বলিয়া ক্রমে ক্রমে জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

জগদ্ রক্ষাকারী ও জীবন্মুক্ত্যভিলাষীর সামান্য বিবাদের কথাও এখানে উল্লেখ যোগ্য। কর্ম্ম-বীরগণ সাধকগণকে অলস বলেন, আবার সাধকগণ কর্ম্ম-বীরগণকে মূঢ় বলেন। এই উভয়প্রকার তিরস্কারই কতক অংশে সত্য। কর্ম্মবীর যদি ঈশ্বর প্রীতি জন্য কর্ম্ম না করেন, যদি তিনি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে না পারেন, তবে তিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারিলেন না ইহাই তাঁহার মূর্খতা। আবার সাধক যদি ক্রম ধরিয়া সাধনা না করেন, প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা পরে যোগ ভক্তি জ্ঞান ইহা যদি তিনি না করেন, তবে তিনি সিদ্ধি লাভ ও করিতে পারেন না, পরন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়বন্ধ করিয়া মনে মনে যখন ধারণা ধ্যান করিতে যান তখন তাহাও সম্পন্ন হয় না এজন্য ধর্ম্ম জীবনে তাঁহার মিথ্যাচার ঘটে।

আত্মরক্ষা ও জগদ্‌রক্ষার জন্য গীতার মীমাংসা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমোদিত হইবে। গীতা বলিতেছেন আত্মরক্ষার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মের ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে লৌকিক কর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্মের কথা যাহা বলা হইয়াছে প্রথম অবস্থায় ঐ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে কৃত হইলেই স্থূল স্থূল ভাবে জগদ্ রক্ষার কর্ম্ম হইয়া থাকে। জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত আবার "জীবে দয়া" প্রদর্শন জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম করেন তাহাতেই যথার্থ ভাবে জগদ্ রক্ষা হইয়া থাকে। ভগবান্ অবতার হইয়াও জগদ্ রক্ষা করিয়া থাকেন। জনকাদি জীবন্মুক্ত ঋষিগণ লোক-সংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বলিতেছেন ঃ—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহ মেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

ভগবানের কোন কর্ত্তব্য নাই তথাপি তিনি যে কর্ম্ম করেন তাহা কেবল লোক শিক্ষার্থ। তিনি কর্ম্ম না করিলে তাঁহার প্রজা তাঁহার পথ অনুসরণ করিবে তিনি তখন সঙ্করজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন। ইহাদিগদ্বারা জগতের ঘোরতর অনিষ্ট হইবে এবং তিনি আপনিই আপন প্রজার বিনাশ কর্ত্তা হইবেন। এই জন্য তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

দেখা গেল আত্মরক্ষার আদিতেও কর্ম্ম—সে কেবল চিত্তশুদ্ধি জন্য। জীবন্মুক্তির পরেও কর্ম্ম—সে কেবল লোক শিক্ষার্থ। ভগবানের অবতার গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করা আর জীবন্মুক্তের কর্ম্ম করা একই কথা। কাজেই আত্মরক্ষা কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত—তাঁহাদের সাধনাবস্থার মধ্য ভাগে কর্ম্ম না থাকিলেও প্রবৃত্ত অবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থার পরে কর্ম্ম আছে। এই কর্ম্মদ্বারাই যথার্থরূপে জগৎ রক্ষা হয়। ইহা না বুঝিয়া যাঁহারা যোগী ভক্ত বা জ্ঞানীকে স্বার্থপর বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল আপন মূর্খত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সমস্ত লোকের মতে জগৎ রক্ষার জন্য কর্ম্ম করাই আত্মার যথার্থ উন্নতি সূচনা করে, কারণ আত্মা জগতের অন্তর্গত বলিয়া জগতের উন্নতিতেই আত্মার উন্নতি, এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আত্মার উন্নতি মোক্ষপথে, জগতের উন্নতি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ হইতে। তত্ত্বজ্ঞ ইহা জানেন যে, যে কর্ম্মে জগতের প্রকৃত উন্নতি হয় সেই কর্ম্মেই যদি কর্ম্মী, জরা আধি ব্যাধি এবং মৃত্যু হইতে রক্ষা না পায় এবং অন্যকে জরা আধি ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তবে ক্ষণিক সুখের আয়োজনকে প্রকৃত উন্নতি বলা যায় না। তত্ত্বজ্ঞ জানেন—আত্মা জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, আত্মার মধ্যেই জগৎ। এই বিশ্ব দর্পণদৃশ্যমান নগরীতুল্য, নিদ্রাকালে আপন মনের মধ্যেই নানা প্রকার স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু অনুভূত হইলেও যেমন মনে হয় ঐ সমস্ত বস্তু বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছে—সেইরূপ জগৎ আত্মার মধ্যে অবস্থিতি করিলেও মনে হয় ইহা বাহিরে রহিয়াছে। আত্মার মধ্যেই এই জগৎ এজন্য প্রকৃত আত্মরক্ষা যিনি করেন তিনি যথার্থভাবে জগদ্ রক্ষাও করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মরক্ষার জন্য আত্মসংস্থ যোগ, ভক্তি-যোগ ও জ্ঞান-যোগ আবশ্যক। জগদ্ রক্ষার জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম আবশ্যক। যেরূপ মনুষ্য হউক না কেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ক্রম অনুসারে এই চারিটি জীবের প্রয়োজন।

সাধারণ লোকে আত্মরক্ষা দ্বারা কিরূপে দেহ ও জগদ্ রক্ষা হয় তাহা

ধারণা করিতে পারে না, শুধু দেহ ও জগদ্ রক্ষার জন্য অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ-রক্ষণই ইহাদের ব্রত। অর্থ-রক্ষা অর্থ-বৃদ্ধি তদ্দ্বারা ক্ষণিক সুখ, যশ মান ইত্যাদি ক্রয়, উত্তরোত্তর আপন অধিকার বৃদ্ধি, জগদ্ অধিকার জন্য শারীরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, মানসিক কৌশল প্রকাশ, কোথাও বা যথাসাধ্য ক্ষণিক পরোপকার দ্বারা চিত্তবিনোদন এই সমস্তই ইঁহাদের মতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

কিন্তু অর্থ ও কামের মূলে যদি ধর্ম্ম না থাকে তবে তাহাতে অনর্থ ই উৎপন্ন হয়। জগদ্ রক্ষার জন্য অর্থও যেমন প্রয়োজন যুদ্ধাদিও সেইরূপ প্রয়োজন। যুদ্ধাদিজন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি বিদ্যাশিক্ষা এবং বুদ্ধিকৌশলে অস্ত্রের সংহার প্রয়োগও আবশ্যক। আবার অর্থাগম জন্য বাণিজ্য কৃষি পশুপালনাদিও আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মরক্ষা ও জগদ্ রক্ষা উভয়ই জীবের প্রয়োজন। আমরা কর্ম্মসঙ্কেতে জগদ্ রক্ষার কর্ম্ম উল্লেখ করিব না এজন্য এস্থানে ত্রিবর্গ জন্য কর্ম্ম বলিয়া রাখিলাম।

কর্ম্ম ভিন্ন জগদ্ রক্ষা বা আত্মরক্ষা হইতে পারে না। কিন্তু কোন্ কর্ম্ম মনুষ্য করিবে? মানুষ যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ, তাহাই তাহার উন্নতির ভিত্তি। স্বভাবজ কর্ম্মকে নিষ্কাম ভাবে করিতে পারিলেই মানবের প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু কোন একটি কর্ম্ম সকল মনুষ্যের স্বাভবিক কর্ম্ম হইতেই পারে না, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। স্বাভাবিক কর্ম্মকে ভিত্তি না করিয়া যদি সকল মনুষ্যের জন্য এক প্রকার কর্ম্মের বিধি করা যায় তবে সমাজ অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক শক্তিকে ভিত্তি না করিয়া যদি সকল মনুষ্যের জন্য এক রূপ ঈশ্বরের সাধনা ব্যবস্থা করা যায়, তবে ধর্ম্মও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে মনুষ্যদিগকে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃতির গুণ অনুসারে মানুষের স্বভাবজ কর্ম্মে ও বিভাগ হইয়াছে। এই গুণ-কর্ম্ম-জনিত বর্ণ বিভাগ স্বাভাবিক।

উপস্থিত সময়ে কথন কথন শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ ধরিয়া জাতীর শ্রেষ্ঠত্ব নীচত্ব নির্ব্বাচিত হয়। শুভ্র-জাতি কৃষ্ণ-জাতি হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট ইহা কতক-গুলি লোকের মত। এই মত যে ভ্রান্ত ইহাও অন্য কতকগুলি লোকে প্রমাণ করেন। প্রতিবাদকারিগণ বলেন যদি এই মত সত্য হইত, তবে কোন কৃষ্ণবর্ণ জাতি কোন শুক্লবর্ণ জাতিকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইতিহাস কিন্তু এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর্য্য জাতির রামকৃষ্ণাদি অবতার কৃষ্ণবর্ণ, অর্জ্জুনাদি রাজা কৃষ্ণবর্ণ, স্বয়ং ব্যাসদেব অঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন।

যাঁহারা জাতি ও বর্ণ ভেদ ঈশ্বর-কৃত বিবেচনা করেন না "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" ইহার যাঁহারা কদর্থ করেন, তাঁহাদের উচিত "স্বভাবজ কর্ম্ম" নিশ্চয় করা। কোন মনুষ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, কোন মনুষ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম যুদ্ধাদি কাহারও সৃভাবজ কর্ম্ম অর্থোপার্জ্জনাদি কাহারও সৃাভাবিক কর্ম্ম সেবা। মানবের যে যে কর্ম্ম সৃাভাবিক সেই সেই কর্ম্মকে নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে। কোন প্রকার নিষ্কাম কর্ম্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে পারে না। সমস্ত বিহিত কর্ম্মই নিষ্কাম ভাবে কৃত হইতে পারে। স্বভাবজ বিহিত কর্ম্মকে নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে ইহাই গীতার প্রথম উপদেশ।

গীতা বলিতেছেন সৃভাবজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া কেহ কখন অন্য সৃভাবের নির্দ্দোষ কর্ম্ম করিবে না। আপন সৃাভাবিক কর্ম্মকেই নিষ্কাম ভাবে করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই প্রকৃত উন্নতি। অন্য প্রকৃতির উৎকৃষ্ট কর্ম্ম দেখিয়া অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাওয়াই পরধর্ম্ম গ্রহণ। পর-ধর্ম্ম গ্রহণে প্রকৃত উন্নতি হয় না কারণ ভিতরে সৃভাবজ সংস্কার থাকিয়া যায়, ঐ সংস্কার প্রবল হইয়া উৎকৃষ্ট পরধর্ম্ম করিতে দেয় না। তখন "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" হইতে হয়। প্রকৃতি প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে সত্য, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এক প্রকৃতিতেই উদয় হয় সত্য, তথাপি যে প্রকৃতিতে যে গুণের আধিক্য তাহাকে তদনুরূপ নামে অভিহিত করা যায়। সাধককে যোগ ভক্তি জ্ঞান এক সময়েই যে অনুষ্ঠান করিতে বলা হইয়াছে, অথচ সর্ব্বদা অনুষ্ঠানের জন্য একটিকে দৃঢ় করিয়া যে ধরিতে বলা হইয়াছে, প্রকৃতির পূর্ব্বোক্ত পরি-বর্ত্তন তাহার অন্যতম কারণ।

চিত্ত শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত রাগ দ্বেষ নিবারণ জন্য কর্ম্মদ্বারা এককালে আত্মার উন্নতি ও জগতের রক্ষা উভয় সাধিত হয়।

চিত্ত শুদ্ধির পরে ভক্তি ও জ্ঞান অভ্যাস। এই সময়ে একান্ত আবশ্যক। এই কালে কামনা ত্যাগ হইতে থাকে বলিয়া কর্ম্মও ত্যাগ হইতে থাকে। আবার সিদ্ধাবস্থায় লোক-রক্ষার্থ কর্ম্ম করিতে হয়। এই অবস্থার কর্ম্মে কোন বন্ধন থাকে না। ভগবান্, এবং জীবন্মুক্ত জনকাদি রাজা কর্ম্ম করেন কিন্তু সুখ দুঃখ লাভালাভ জয়পরাজয় রূপ আসক্তি সে সমস্ত কর্ম্মে থাকে না।

বলা হইতেছে উপাসনা ও যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই সাধনা দ্বারাই পূর্ণ-

শক্তির বিকাশ হয়। আপন সীমাশূন্য শক্তির পূর্ণানুভবই জীবন্মুক্তি। জগতকে প্রকৃত পক্ষে উন্নত করিতে জীবন্মুক্তই সমর্থ।

আত্মরক্ষার জন্য কর্ম্ম করিলে অনেকদিন জগতের উদ্ধার জন্য কর্ম্ম বাদ দিতে হয়, এ কথা সত্য, যতদিন উপাসনার ভূমিকায় মানুষ থাকে ততদিন কর্ম্ম থাকে, কিন্তু ভক্তি ও জ্ঞান ভূমিকায় আসিলে কোন কর্ম্ম থাকিতে পারে না এই সময়ে কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়। এই সময়ে যিনি জগৎকে ভুলিয়া থাকিতে হয় বলিয়া দুঃখিত হয়েন জগতের দুঃখে বড়ই কাতর হয়েন তিনি না হয় জগতের জন্য চিরদিনই কর্ম্ম করুন, আর চিরদিনই জনন মরণ লাভ করুন। কিন্তু যাঁহারা জনন মরণ রূপ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাঁহাদের জন্য এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে—যে জগৎস্রষ্টা স্বদেশ সংস্কারক অপেক্ষা জগতকে অধিক ভালবাসেন। সংস্কারক উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎ রক্ষা না হয় ভগবানই করিলেন, তাহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে। "যাঁহার এই জগৎ তিনিই ইহার জন্য পথ দেখিবেন" এই বিশ্বাস করিয়া স্বদেশ হিতৈষিগণ যদি আত্মরক্ষার কার্য্যটি সারিয়া এবং সেই কার্য্য করিতে করিতে জগদ্ রক্ষা সংগ্রামে নিযুক্ত হয়েন, তবে আর তাঁহাদিগকে এই ঘোর জগৎ-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া নিতান্ত দীনের মত এই সংসার হইতে বিদায় লইতে হয় না।

এক্ষণে গীতার কর্ম্ম সংকেতের সার কথা আলোচিত হইবে।

পঞ্চম কথা

গীতার কর্ম্ম সঙ্কেত।

কর্ম্ম সঙ্কেতের এক অংশ আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে কর্ম্ম সঙ্কেতের সমস্তই প্রায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে জীবন্মুক্তি ও সাধনার কথা বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

কর্ম্ম সঙ্কেতের সার কথা ব্রাহ্মীস্থিতি। পরমানন্দে নিত্য স্থিতির নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাই জীবন্মুক্তি। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রহ্ম হওয়া যায়। পরমানন্দে স্থিতি ভিন্ন জীবের সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তির অন্য পথ নাই।

মৃত্যু জরা ব্যাধি অতিক্রম করিতে হইলে ব্রাহ্মীস্থিতি আবশ্যক, ব্রাহ্মীস্থিতি ভিন্ন পূর্ণ শান্তি অসম্ভব, পূর্ণভাবে দুঃখনিবৃত্তিও সুদূরপরাহত।

প্রশ্ন হইতে পারে—জরা মরণ কি অতিক্রম করা যায়? গীতাই এই প্রশ্নের উত্তর করিবেন—গীতা বলেন—

"জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।" ৭।২৯

জরা মরণ অতিক্রম জন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা সাধনা করেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—মনুষ্য জরা মরণ অতিক্রম করিতে পারে। তজ্জন্য সাধনা চাই। গীতা আবার বলিতেছেন—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবান্।

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥

দেহ সমুদ্ভব এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যুজরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহী পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। এই পরমানন্দে স্থিতিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি।

অনেকের ধারণা—জীব কখন ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, এই ধারণা ভ্রান্তিমাত্র। গীতা বলিতেছেন—

"প্রশান্তমনসংহ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ৬।২৭

রজোগুণ শূন্য প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত এই যোগীকে উত্তম সুখ আপনিই আশ্রয় করে।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতি বাক্যের সহিত গীতার ঐকমত্য আছে। গীতা বলিতেছেন—

"নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।" ৫।১৯

ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান ও নির্দ্দোষ, অতএব তাঁহারা ব্রহ্মভাবেই স্থিতিলাভ করেন। আবার বলিতেছেন—

"স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।"

স্থির-বুদ্ধি মোহহীন ব্যক্তি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ করেন।

আরও কত আছে—

"লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।" ৫।২৫

ক্ষীণপাপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

কেহ বলেন ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ কি প্রার্থনীয়? নির্ব্বাণে ত কিছুই থাকে না। এইরূপ উক্তি যে ভ্রান্তি মাত্র, তাহা গীতাই প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রহ্ম হইয়া গেলেই জীবন্মুক্ত ভগবানের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।

সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ১৪।২

এই জ্ঞানলাভ করিলেই আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্তি হয়, তখন তাঁহারা আর সৃষ্টি কালেও উৎপন্ন হয়েন না, প্রলয় কালেও প্রলয় দুঃখ অনুভব করেন না।

ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ—ইহাই পরমানন্দ প্রাপ্তি। ব্রহ্ম হইয়া গেলে মানুষ যে জড়ের মত অবস্থান করে, যাহাদের মত এই, তাহাদিগকে গীতা বলিতেছেন—

"সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।" ৬।২৮

"সব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে।" ৫।২১

ব্রহ্ম সংস্পর্শ মাত্র যে সুখ, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ। যোগ দ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত হইতে পারিলেই অক্ষয় সুখ লাভ হয়। ব্রহ্মই অক্ষয় সুখস্বরূপ।

ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারিলে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, আর কখন তাহাকে পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতে হয় না। কারণ যিনি ব্রহ্মে নিত্য অবস্থিত, যিনি পরমানন্দে নিত্য স্থিতি লাভ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম কোথায়?

আজ কাল অনেকেই পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করেন না। আবার কেহ কেহ পুনর্জ্জন্মের বিকৃত অর্থও করেন। গীতা ইহাদিগকে নিরাশ করিতেছেন—গীতা বলিতেছেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।

তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সমুদায় জানি, কিন্তু তুমি জান না। শত বিকৃত অর্থ করিলেও পুনর্জ্জন্ম নাই, একথা হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও দৃষ্ট হয় না। "অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ" আপনার জন্ম পরবর্ত্তী এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্ববর্ত্তী, অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ—অবতার লীলাকারী মায়া মনুষ্য—স্পষ্ট ভাবেই জন্ম জন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন। আরও বহুস্থানে পুনর্জ্জন্মের কথা উক্ত হইয়াছে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮।১৬

ব্রহ্ম লোক হইতে সকল লোক পুনরায় আবর্ত্তনশীল, কিন্তু আমাকে পাইলে লোকের পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুনর্জ্জন্মের অন্য অর্থ হইতে পারে না। একবার মনুষ্য হইলে আর যে মানুষ নিম্ন যোনিতে পতিত হয় না এ কথারও কোন যুক্তি নাই।

গীতা বলিতেছেন ঃ—

"ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।" ১৬।১৯
আসুরীং যোনি মাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ১৬।২০

আমি (আমার হিংসাকারী ক্রূর নরাধম অশুভ সেই সকল ব্যক্তিকে) সংসারে আসুরী যোনিতে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ভগবান্ শঙ্কর ব্যাখ্যাতে বলিতেছেন "আসুরীষ্বেব ক্রূর কর্ম্মপ্রায়াসু ব্যাঘ্রসিংহাদিযোনিষু ক্ষিপামি"।

শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন "আসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষু"। শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী উপরোক্ত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন "অথ কপূয় চরণাঃ অভ্যাসেহকপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বেতি" কপূয়চরণাঃ কুৎসিতকর্ম্মাণঃ অভ্যাসেহ-শীঘ্রমেব কপূয়াং কুৎসিতাং যোনিমাপদ্যেরন্ ইতি শ্রুতেরর্থঃ।

"ততো যান্ত্যধমাং গতিং" গীতার এই উক্তির ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্কর বলিতেছেন "অধমাং নিকৃষ্টতমাম্" শ্রীমান্ স্বামী বলিতেছেন "অধমাং ক্রিমি কীটাদিগতিম্"। অন্য অন্য শাস্ত্রও জীবের নানাযোনিভ্রমণের কথা বলিতেছেন, তথাপি যাঁহারা বলেন—পুনর্জ্জন্ম নাই, মনুষ্য হইলে আর সিংহ ব্যাঘ্র ক্রিমি কীটাদি হইতে হইবে না, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা কিরূপে করি?

মহাভারত বলিতেছেন ঃ—

"ধাম্নো ধামসহস্রাণি মরণান্তানি গচ্ছতি।
তির্য্যগ্‌যোনি মনুষ্যত্বে দেবলোকে তথৈবচ।"

শান্তিপর্ব্ব ৩০৫।২

জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্তদ্বারাই জগতের অজ্ঞান নাশ হয়। রোগী ঔষধ-সেবনে চীৎকার করে বলিয়া যদি ঔষধ পরিত্যাগ করা যায়, তবে রোগীর মৃত্যু

অবশ্যম্ভাবী। অজ্ঞানীর জ্বালা চিরদিনই থাকিবে। একটু প্রাণে ব্যথা লাগিবে বলিয়া জ্ঞানীর সিদ্ধান্ত চাপিয়া রাখা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাতে জগতের অনিষ্ট ই হয়। জগতের মঙ্গল হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞানীর উক্তি নিরসন হইল। এক্ষণে কিরূপে জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়, সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

সাধনার কথা বলিবার পূর্ব্বে জীবন্মুক্তিলাভকরণোপযোগী শক্তি জীবের আছে কি না ইহার আলোচনা আবশ্যক।

ভগবান্ জীবকে ত্রিবিধ শক্তি দিয়াছেন—জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াশক্তির আধার প্রাণ, ইচ্ছাশক্তির আধার মন এবং জ্ঞান শক্তির আধার বুদ্ধি। প্রাণ শরীরকে রক্ষা করে, মন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিষয় ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ রসে পূর্ণ হয় এবং বুদ্ধি বিচার দ্বারা আত্মার স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া জীবন্মুক্তি প্রদান করে। প্রাণায়ামাদি যোগ, ভক্তি যোগ এবং সাংখ্য-জ্ঞান সাহায্যে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হইতে পারে। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে একটির সাধনাতে তিনটিই আইসে, যদি সাধক কর্ম্ম মধ্যে আটকাইয়া না যান। আর এই তিন শক্তি দ্বারা যে জীবন্মুক্তি লাভ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গীতা এই তিনটি পথ প্রথমে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে যে সাধনা দ্বারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা যায় তাহাও বলিতেছেন। আমরা সাধনার কথা পরে বলিব, এক্ষণে যাহা করিতে হইবে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

যে সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি কর্ম্মই করুন বা কর্ম্ম শূন্যই থাকুন সর্ব্বদাই আনন্দে তিনি পূর্ণ। শাস্ত্রে দেখা যায়, বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং রাম কৃষ্ণাদি অবতার যখন একান্তে থাকেন—যখন অন্য কোন কর্ম্ম না করেন, তখন ধ্যানতৎপর হইয়া সমাধি-বিশ্রাম করেন। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি ঃ—

সৌমিত্রিরেকদা রাম মেকান্তে ধ্যানতৎপরম্।
সমাধিবিরমে ভক্ত্যা প্রণয়াদ্ বিনয়ান্বিতঃ॥

অব্রবীদ্দেব ইত্যাদি।

জীবন্মুক্তি হইয়া গেলে সমাধি-সহকৃত ধ্যানানন্দ সর্ব্বদা আয়ত্ত হয়।

জীবন্মুক্তির নিকটে যাঁহারা গিয়াছেন, যাঁহারা ধ্যানানন্দ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ভোগ করিলেও সর্ব্বদা ঐ অবস্থায় থাকিতে পারেন না, তাঁহারা যখন ঐ অবস্থায় না থাকিতে পারেন, তখন সাংখ্য-যোগে অবস্থান করিবেন। সাংখ্য-যোগ অর্থ, বিচার যোগ। বুদ্ধিই বিচার করে। বুদ্ধিই জীবের শক্তি সমূহের মধ্যে প্রধান। বুদ্ধি বিচার করিয়া দেখাইয়া দেয়—এই সংসারাড়ম্বর মনোবিলাস মাত্র—ইহা চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। আত্মা কিন্তু এই সমস্ত দৃশ্যমান মনোবিলাস হইতে ভিন্ন। এই ভূমিকায় সাধক "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদাঽনঘ"। প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা অনুভব করেন। সাংখ্যের সদৃশ জ্ঞান আর নাই, যোগের সদৃশ বলও নাই। সাংখ্য ও যোগ, সিদ্ধাবস্থাতে একই ফল প্রদান করে বলিয়া উভয়কেই এক বলা হইয়াছে। যোগ অপেক্ষা শাস্ত্রে সাংখ্য জ্ঞানের অধিক প্রশংসা দেখা যায়। মহাভারত শান্তি পর্ব্বে ৩০২ অধ্যায়ে দেখা যায়—"বিজ্ঞতম সাংখ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞান বলেই পরমগতি লাভ করেন, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীষিগণ এই সাংখ্য মতকে অক্ষয়, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম ইত্যাদি নাম দিয়াছেন, উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরমর্ষিরা শাস্ত্র মধ্যে সাংখ্য মতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। বেদ, যোগ-শাস্ত্র, অর্থ-শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পারমাত্মিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই সাংখ্য শাস্ত্র হইতে গৃহীত। সাংখ্য মতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য-সমুদায় সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের অধোগতি হয় না। যাঁহারা সাংখ্যমত গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞানান্বেষণে যত্নবান হন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তির্য্যগ্‌যোনি-গমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহবাস জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। যিনি মহার্ণব তুল্য অতিবিশাল এই পুরাতন সাংখ্য মত সম্যগ্‌রূপে অবগত হয়েন, তিনিই নারায়ণ-স্বরূপ"। সাংখ্য মতের প্রধান উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ করিবে—দেহ, সংসার, জগৎ প্রভৃতি কোন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিবে না, ইহারা কেহই আত্মা নহে, ইহারা মিথ্যা, এইরূপ ব্যবহার-পরায়ণ থাকিবে এবং আমিই আত্মা, আমি দেহ নহি, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি মনো-বিলাসের দ্রষ্টা, সর্ব্বদা ইহা আলোচনা করিবে।

এই ভূমিকার স্থিতিলাভে অসমর্থ হইলে বুদ্ধি হইতে মনে নাবিতে হইবে। ভক্তিযোগ মনেরই কার্য্য। মানসপূজা ভক্তিযোগের সার বস্তু। ভক্তিযোগে

মন রসে পূর্ণ হইলেই জ্ঞানযোগে যাইতে পারা যায়, তৎপরেই আবার ধ্যান-যোগে উঠিতে পারা যায়।

যাঁহারা ভক্তিযোগেও না থাকিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মনের সাধনা হইতে প্রাণের সাধনায় আসিতে হইবে। এই প্রাণের সাধনায় প্রধান কার্য্য প্রাণায়ামাদি। প্রাণায়ামাদি যাঁহারা অস্বাভাবিক বলেন, তাঁহাদিকে গীতার উক্তিই স্মরণ করাইয়া দিতে হয়।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন—

অপানে জুহ্বতিপ্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতারুদ্ধা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ৪।২৯

আবার বলিতেছেন—

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ৫।২৭

অন্যত্র ভগবান্ বলিতেছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥

প্রাণ ও অপান বায়ুকে সাম্যাবস্থায় আনিলে দেহের মধ্যে অগ্নি উপলব্ধি হয়। ইহাতেই জীবন ধারণ হয়।

বিনা অগ্নিতে জীবন ধারণ হয় না। আহার না করিয়াও যাহারা দেহে অগ্নি রাখিতে পারেন, তাহাদের আহারও আবশ্যক হয় না। সর্পাদি জীব শীতকালে ভূগর্ভে বাস করে, ভূগর্ভ অত্যন্ত উষ্ণ—সেইজন্য তাহারা ৫।৬ মাস কোন কিছু আহার না করিয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে। যাঁহারা যোগাদি সাধনা করিতেও পারেন না, তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাসে আত্মসংস্থ যোগের উপযুক্ত হইবেন। উপাসনা নিষ্কাম কর্ম্মের নিম্ন অবস্থা। এই সাধনার ক্রম আমরা গীতা হইতে দেখাইয়াছি।

এই কথার উপসংহারে আমরা বলি—প্রাণ শরীর রক্ষা করে, মন সঙ্কল্প বিকল্প তুলিয়া মনোরাজ্য রচনা করে এবং বুদ্ধি বিচার দ্বারা সৎ অসৎ ভেদ জানাইয়া দেয়। প্রাণ-স্পন্দন রহিত হইলে মনের বিষয়চিন্তাও শেষ হইল। মন আত্মসংস্থযোগে স্থির হইলে অন্য কোন চিন্তাই থাকে না। কিন্তু এই

অবস্থা স্থায়ী হয় না বলিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে হয়। ভক্তিযোগে মন ভগবদ্‌রসে সিক্ত হইলেই বুদ্ধি আত্মস্বরূপ জানাইয়া দেয়। এই অবস্থায় কোন কামনা থাকে না। মন সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য হইলেই জীব আপন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। এই অবস্থাকে জাগ্রত বলা যায় না, নিদ্রাও বলা যায় না, অথচ ইহা সর্ব্বপ্রকার জাড্যবর্জ্জিত অবস্থা—ইহাই স্বরূপাবস্থা। দৃঢ়রূপে সর্ব্বকামনাবর্জ্জিত অবস্থায় থাকাই ব্রাহ্মীস্থিতি। এই স্থিতি নিত্য, ইহা জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। স্থিতি নিত্যজ্ঞান ও আনন্দেই হয়। ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ করিয়াও ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া থাকা যায়।

জীবন্মুক্তি জন্য প্রধান সাধনা -

"সঙ্কল্প-প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়-গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃশনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি-গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ৬।২৫ অধ্যায়।

এই সাধনার অঙ্গীভূত কার্য্যগুলি এই—

(১) নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মশূন্য অবস্থালাভ, একান্তে গমন, সঙ্কল্প-প্রভব কামনা ত্যাগ।

(২) আত্মাতে মনোযোগ করিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয় নিয়মিত করা।

(৩) বুদ্ধি দ্বারা আত্মার স্বরূপানুভব, মনকে আত্মসংস্থ করা।

মোক্ষের জন্য চারি আশ্রম দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রম প্রায় সকলকেই অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন সাধক ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হইয়াই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার জন্য যেমন অন্য আশ্রম আবশ্যক হয় না, সেইরূপ কোন সুকৃতিশালী সাধক যদি আত্ম-সংস্থ সমাধিতে স্থির হইয়া যান, তখন তাঁহার অন্য সাধনা আবশ্যক হয় না। ঐ সমাধি হইতেই একবারে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আত্মসংস্থ যোগে স্থিতি লাভ সকলের ভাগ্যে হয় না, এই জন্য দৃঢ় ভাবে আত্মসংস্থ হইবার জন্যই ভক্তি যোগ ও সাংখ্যজ্ঞান। সাংখ্যজ্ঞানদ্বারাই সমাধিসহকৃতধ্যানযোগে স্বস্বরূপে অবস্থান! "তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপেঽবস্থানম্" হইাই জীবন্মুক্তি।

আমরা জীবন্মুক্তি জন্য কর্ম্মগুলি মোটামুটি বুঝিলাম। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার

অধিকারীর জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমগুলি আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। যেমন পুনঃ পুনঃ অভ্যাস সিদ্ধির প্রাণ, সেইরূপ পুনরুক্তি জীবন্মুক্তির জন্য নিতান্ত আবশ্যক। আমরা সকল প্রকার কর্ম্ম এস্থানে উল্লেখ করিব—

(১) যতদিন না জীব ও ব্রহ্মের একতাবোধরূপ জ্ঞানে জীব শান্তি লাভ করে, ততদিন ঈশ্বরে মন রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিতে হইবে। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের উদ্দেশ্য বিষয়সঙ্কল্পত্যাগ, আত্মরসাস্বাদন ও পরমানন্দে স্থিতি। ইহাই গীতার সাধারণ কর্ম্ম।

কিন্তু এই কর্ম্মের জন্য আয়োজন অনেক। প্রথমেই ভিত্তি—বিষাদ-যোগই সর্ব্ব উপদেশের ভিত্তি। এ ভিত্তিতে না দাঁড়াইলে পরমানন্দ-পথের পথিক হওয়া যায় না। জন্মমরণভীতি হইতে যিনি মুক্ত হইতে চাহেন না—সর্ব্বপ্রকার দুঃখেরআত্যন্তিক নিবৃত্তি যাঁহার লক্ষ্য নহে, তিনি কখন আত্মজ্ঞান ও আত্মানন্দের ভিখারী নহেন। দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি যাঁহার লক্ষ্য তাঁহার জীবন্মুক্তি হইবে না। মৃত্যু ভীতিতে ব্যাকুলতাই বিষাদ যোগ।

২। বিষাদ-যোগ-ব্যাকুল চিত্তের প্রতিই সমস্ত আর্য্য-শাস্ত্রের উপদেশ। ভগবান্ বশিষ্ঠের উপদেশ বিষাদ-যোগী রামচন্দ্রের প্রতি, গীতার উপদেশ বিষাদ-যোগী অর্জ্জুনের প্রতি, চণ্ডীর উপদেশ বিষাদ-যোগী সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের প্রতি এবং ভাগবতের উপদেশ বিষাদ-যোগী মুমূর্ষু পরীক্ষিতের প্রতি।

৩। একটু স্থির হইলেই দেখা যায়—সকল জীবই মৃত্যুভয়গ্রস্ত। ব্যাধি আধি সকলেরই আছে। কখন কোন্ ব্যাধি বা আধি মৃত্যুর অনুচর হইয়া আইসে, তাহার নিশ্চয় নাই। এতদ্ভিন্ন কোন্ দৈব কারণে কখন যে মৃত্যু আসিবে, কোন্ ভূতদ্বারা জীব কাল-কবলিত হইবে, কে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? শত সাবধান হইলেও মৃত্যু হইতে সাধারণ জীব রক্ষা পায় না। যদি পাইত, তবে রাজা বা রাজপুত্রের মৃত্যু হইত না।

৪। মৃত্যু ভয় লইয়া সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বিষাদ জাগিবে। এই মধুর হাসিনী স্ত্রী, এই প্রিয় পুত্র, এই স্নেহাস্পদীভূতা কন্যা—ইহারাও মরিবে—কখন মরিবে তাহার নিশ্চয় নাই। তবে আর কোন্ সুখের জন্য এই অস্থায়ী সংসার আড়ম্বর? কেন এই বৃথা চেষ্টা? স্বজন বন্ধু বান্ধবের মরণ চিন্তাতেই অর্জ্জুনের বিষাদ-যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ মৃত্যুচিন্তায় বিষাদ যোগ দৃঢ় হয়।

৫। বিষাদ-যোগে যখন চিত্ত ব্যাকুল হয়, যখন প্রাণ সর্ব্বদা কাতরতা অনুভব করে, মন যেন সর্ব্বত্রই মৃত্যুর ছায়া দেখে, তখন চিন্তা আইসে—এই মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে কি উদ্ধার নাই? কেহ কি আমার নাই? জীব নিরাশ্রয় হইলেই আশ্রয় অনুসন্ধান করে।

৬। রক্ষার উপায় আছে। গীতা-শাস্ত্রে ভগবান্ বিষাদ-যোগীকে যে যে পথের মধ্যদিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাই রক্ষার পথ। আত্মরক্ষার উপায় জানিয়া সংসার-কুরুক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সংসারের জন্য আত্মবলি দাও, এ কার্য্যে প্রশংসা আছে—কিন্তু এইরূপ আত্ম-বলিতে সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য করা হইল না, ইহাতেও অজ্ঞান আছে। আত্মরক্ষা ও জগদ্রক্ষা উভয়ই আবশ্যক।

৭। রক্ষার উপায়গুলিও স্বাভাবিক হওয়া চাই। কর্ত্তব্যটি পূর্ণ কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। মনুষ্যের পূর্ণ কর্ত্তব্য কি, ইহা ধারণা করা কঠিন। যে মনুষ্য-দেহ ভিন্ন অন্যদেহে জীবন্মুক্তি-সুখ লাভ হয় না, সেই দেহ যাঁহাদের নিকট লাভ করিয়াছি—যাঁহারা এই দেহরক্ষা জন্য সহায়তা করিয়াছেন—সুবুদ্ধি জীব আপনাহইতে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। বালক নিজ জীবনের জন্য বহু জনের নিকট ঋণী। পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গ, আত্মীয় স্বজনাদি, সমাজ এবং মানবজাতি ইহাদের সকলের উপর কর্ত্তব্য পালনকরিতে না পারিলে কৃতঘ্ন হইতে হয়। আদি কবি ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন :—

কৃতার্থাহ্যকৃতার্থানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে।

কে না স্বীকার করে—যে সমাজ, পরিবার, ও জাতির সাহায্য বিনা জীবন-ধারণ অসম্ভব। তথাপি কাহারও সামর্থ্য-সত্ত্বেও যদি সে ব্যক্তি জগতের জন্য কোন কার্য্য না করে, তখন সে ব্যক্তি কৃতঘ্ন। যাহারা স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া অকৃতার্থ মিত্রদিগের কার্য্য-সাধনে যত্নবান্ না হয়, তাহারা কৃতঘ্ন। কৃতঘ্ন মৃত হইলে ক্রব্যাদগণও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না। রামায়ণ কৃতঘ্নসম্বন্ধে বড় কঠিন দণ্ড বিধান করিতেছেন। বলিতেছেন :—

"কৃতঘ্নঃ সর্ব্ব ভূতানাম্ বধ্যঃ"।

বলিতেছেন—

"গোঘ্নেচৈব সুরাপেচ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥"

কৃতঘ্ন সর্ব্বপ্রাণীর বধ্য। সাধুগণ গোঘ্ন, সুরাপায়ী ও ভগ্নব্রত ব্যক্তিদিগের নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্ন পুরুষের নিষ্কৃতিবিধান করেন নাই। জগতের নিকটে উপকৃত হইয়া যাহারা সামর্থ্যসত্ত্বেও জগতের কোন কার্য্য না করে, তাহারা কৃতঘ্ন। কিন্তু জগতের জন্য কর্ম্ম যদি নিষ্কাম ভাবে কৃত না হয়, তবে তাহা অনিষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। এই নিষ্কাম-কর্ম্মই আত্মজ্ঞান-লাভের প্রথম কর্ম্ম। এই জন্য বলা হয়—আত্মজ্ঞানের কার্য্যে আত্ম-রক্ষা ও জগদ্-রক্ষা উভয়ই সম্পাদিত হয়।

৮। আত্মার স্বরূপ জানাই আত্মজ্ঞান। সাংখ্য-জ্ঞানই আত্মজ্ঞান-লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আত্মার স্বরূপ জানিলেই জনন-মরণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিত্য-আনন্দে স্থিতি লাভ হয়। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। "ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ, সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ" ভগবান্ শঙ্কর ইহার এই অর্থ করিয়াছেন।

৯। সাংখ্য-জ্ঞান উপদেশ দিতেছেন "আত্মার মৃত্যু নাই, আত্মার কোন দুঃখ নাই, ভয় নাই, অজ্ঞান নাই—আত্মা আনন্দময়"। গীতা বলিতেছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ,
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২।২০

এই আত্মাকে শস্ত্রে ছেদন করা যায় না, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না, জলে সিদ্ধ এই আত্মা হয় না, বায়ুতেও শুষ্ক হয় না। ইঁহার জননমরণাদি বা সংসার নাই, কোন অভাব নাই। আত্মার স্বরূপই এই। আমি দেহ নহি, জগতও নহি, আমিই এই আত্মা, কাজেই আমার জন্ম মৃত্যু নাই, আধি ব্যাধি নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, কোন অভাব নাই, সংসার নাই, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সাংখ্যজ্ঞানে ইহা যিনি অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন্মুক্তি হইয়াছে। জগৎসম্বন্ধে সাংখ্য-জ্ঞানী বলেন জগৎ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, এই জগৎ আমি নহি, ইহার কোন্ বস্তুও আমি নহি, আমারও নহে, কারণ আমি স্বরূপে সর্ব্বত্র পূর্ণ। জগৎ যাহাই হউক—যাহাকে আমি সংসার বলি, যাহার ভাবনায় আমি পীড়িত হই, এ সংসার আমার মনোবিলাস মাত্র—ইহা আমার চিত্তস্পন্দনজন্য কল্পনা

মাত্র—এই মনোবিলাস হইতেই ভুল 'আমি আমার' সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত "আমি"তে যাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার নিকট দুই চারিটা ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইলেই বা কি, দুই দশটা ব্রহ্মাণ্ড নূতন হইলেই বা কি!

জীবের স্বরূপই এই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ আত্মা। মহাভারত বলিতেছেন— "মূঢ়ব্যক্তিরা শাশ্বত পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে, কিন্তু সাধুব্যক্তিরা তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন। যোগী ও সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞানকেই সবিশেষ প্রশংসা করেন—শান্তিপর্ব্ব ৩১৮ অধ্যায়—"তস্য দ্বাবনু-পশ্যেতাং তমেকমিতি সাধবঃ"। উপনিষদ্ বলিতেছেন—

'সর্ব্বভূতাধিবাসঞ্চ যদ্ ভূতেষু বসত্যধি।
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ ॥"

যিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয় হইয়াও আবার সর্ব্বভূতেই বাস করেন, এবং যিনি সর্ব্বলোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আমিই সেই বাসুদেব স্বরূপ—এই প্রকারে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ভাবনা করিবে।

আত্মা কিরূপে দেহ হইয়া যায়, সাংখ্য-জ্ঞানী তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দেহ-হইতে মুক্ত হইবার কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকেন। আত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেহের সুখকে আপনার সুখ এবং দেহের দুঃখকে আপনার দুঃখ বোধ করিতে থাকেন। এই সুখ ও দুঃখ অনুভূতি দ্বারাই আত্মা দেহে বদ্ধ হইতে থাকেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করিতে করিতে আত্মা দেহই হইয়া যান। চক্ষুরাদি যাহাকে সত্য বলে, দেহাভিমানী আত্মা তাহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। দেখাগেল—সুখ-দুঃখ-অনুভূতিই আত্মার দেহত্ব-প্রাপ্তির কারণ। সাংখ্য-জ্ঞানী তাই সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে বলেন, শীত উষ্ণকে অবজ্ঞা করিতে বলেন, যতই আপন স্বরূপ চিন্তা হইতে থাকিবে, ততই সুখ দুঃখ যে আমার নহে, ইহা দেহের এবং দেহ আমি নহি, আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ— ইহা বোধ হইতে থাকিবে। দেহের সুখদুঃখের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা, দেহের নিদ্রা-আলস্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই, এই বোধ নিশ্চয়রূপে সিদ্ধ হইলেই সাংখ্য-জ্ঞানের কার্য্য হইয়া গেল। "আমি আত্মা" সাংখ্য-জ্ঞানী বিচার দ্বারা এবং সাধনাদ্বারা ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন।

'আমিই পরমাত্মা' এ বিষয়ে সাংখ্য-জ্ঞানীর উক্তি আমরা মহাভারত হইতে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

মমাস্ত্বধিগবুদ্ধস্য যোঽহং মগ্নমিমং পুনঃ।
অনুবর্ত্তিতবান্মোহাদন্যমন্যং জনাজ্জনম্ ॥ ২৬
অয়মত্রভবেদ্বন্ধুরনেন সহ মে ক্ষমম্।
সাম্যমেকত্ব মায়াতো যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ॥ ২৭
তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোঽহমনেন বৈ।
অয়ং হি বিমলো ব্যক্তমহমীদৃশক স্তথা ॥ ২৮
যোঽহমজ্ঞানসম্মোহাদজ্ঞয়া সম্প্রবৃত্তবান্।
সসঙ্গয়াঽহং নিঃসঙ্গঃ স্থিতঃ কালমিমংত্বহম্ ॥

হায়! আমি অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়াছি, অতএব আমাকে ধিক্। পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহাহইতে অভিন্ন হইতেপারি। তাঁহাহইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত, সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম, আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? (৺কালী সিংহের অনুবাদ ৩০৮ অধ্যায়)

প্রকৃতি হইতে জীবাত্মা পৃথক্—প্রকৃতিই গুণবিশিষ্টা, ঐ প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও জীব যখন আপনাকে নির্গুণ অনুভব করিতেপারেন তখনই তিনি বিশুদ্ধ। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। যখন মিশ্রিত হয়েন, তখন পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। এই জন্য দেহের সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, শীত, উষ্ণাদি অনুভব, এ সমস্ত আমার নহে, ইহারা দেহের বা প্রকৃতির, এই বোধ স্থায়ী হইলেই' সাংখ্য-জ্ঞান-সাধনা পূর্ণ হইল।

১০। জীব ও ব্রহ্মের একতাই সাংখ্যজ্ঞান। সমস্ত গীতাতে 'তত্ত্বমসি' (তৎ ত্বম্ অসি) ইহার বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম আছেন, ইহা নিশ্চয় হওয়ার নাম পরোক্ষ-জ্ঞান। 'আমার আত্মাই ব্রহ্ম' এতদনুভূতির নাম অপরোক্ষ-জ্ঞান। অপরোক্ষানুভূতিব্যতীত সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই।

১১। বিনা কর্ম্মে অপরোক্ষ-জ্ঞান-লাভের সাধনা হয় না। জ্ঞানলাভ-জন্য যে সমস্ত কার্য্য আবশ্যক, তাহার প্রথম ভূমিকায় নিষ্কাম কর্ম্ম, দ্বিতীয়-ভূমিকায় আত্মসংস্থ-যোগ, তৃতীয়-ভূমিকায় ভক্তিযোগ এবং চতুর্থ-ভূমিকায় জ্ঞান-যোগ। এই সমস্ত সাধনার কথা পূর্ব্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

১২। পুস্তকে পড়িয়া যেমন যুদ্ধ করা যায় না, সেইরূপ পুস্তকে দেখিয়া যোগশিক্ষা করাযায় না। যতদিন না কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্ম করা না যায়, ততদিন জ্ঞান-লাভের সাধনা হয় না।

১৩। প্রথম ভূমিকা নিষ্কাম-কর্ম্ম। প্রথম-অবস্থায় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতির জন্য করিতে হইবে। কর্ম্মের আদিতে মধ্যে ও অন্তে স্মরণ রাখিতে হইবে—কর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিতেছি। নিষ্কাম কর্ম্মের সিদ্ধি তখন, যখন মন সর্ব্বদা আত্মসংস্থ, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি আপন অভ্যাসে ব্যাবহারিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তবেই দেখা গেল—আত্মসংস্থযোগ ভিন্ন নিষ্কাম-কর্ম্ম ঠিক্ ঠিক্ সম্পন্ন হয় না।

গীতা বলিতেছেন—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি", "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম।" বুদ্ধির সাহায্যে যতক্ষণ না মন আত্মাতে সমাধিলাভ করে, ততক্ষণ যোগ হয় না। বুদ্ধিও যখন অবিচলিত হইয়া আত্মাতে নিশ্চল না হইবে, ততক্ষণ যোগ হইবে না—

"সমাধাবচলা বুদ্ধি স্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥"

১৪। কিন্তু মন সঙ্কল্পযুক্ত থাকিলে যোগ হয় না। যিনি কর্ম্মের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে না পারিয়াছেন, তিনি যোগী নহেন—

"নহ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।"

যিনি অসংযমী, তাঁহার যোগ হয় না—

"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।"

১৫। ভোগেচ্ছার নাম কামনা। কামনাই আত্মসংস্থ হইতে দেয় না। বিষয়ভোগের কামনা থাকিতে কখন আত্মাস্বাদ হইতে পারে না। কামনাই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখে। এইজন্য গীতা বলিতেছেন—

"জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।"

১৬। কামনা জয় হইবে কিরূপে? কামনার দুর্গ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—

"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।"

এজন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে ফিরাইতে হইবে। কিন্তু মন যতক্ষণ বুদ্ধির বিচার না শুনিবে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়জয় হইবে না। বুদ্ধি একদিকে বস্তু-বিচার দ্বারা বস্তুর অনিত্যত্ব দেখাইতেছে, অন্যদিকে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি নিত্যবস্তুর রূপ, গুণ ও স্বরূপ দেখাইতেছে। একদিকে বিষয়-বৈরাগ্য অন্য দিকে আত্মসংস্থ হইবার জন্য অভ্যাস। বৈরাগ্য ও অভ্যাস ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় হয় না। সর্ব্বকর্ম্মে কৃষ্ণ-স্মরণ—ইহা কামনা- জয়ের প্রথম অবস্থা।

১৭। "জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের জন্ম ও কর্ম্মরূপ তটস্থ-লক্ষণ তত্ত্বতঃ জানা উচিত। ইহাই ভক্তির সোপান। বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না। যোগও ভক্তিপূর্ব্বক করিতে হইবে। প্রাণ-সংযমন একটি প্রধান সাধনা। বহু প্রকারে প্রাণসংযম হয়। গীতা দ্বাদশ-প্রকার যোগের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু দ্রব্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, আবার সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি আচরণ করিতে করিতে ক্রম-অনুসারে জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

"যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"

১৮। যোগ না করিয়া যদি কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করে—আত্মসংস্থ হইতে না শিখিয়া যদি কেহ কর্ম্ম-ত্যাগ করে, সে নিতান্ত দুঃখ পায়—"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ"। যোগীর কর্ম্ম কেবল আত্মশুদ্ধি জন্য। যিনি যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁহাকে গুরু-উপদেশে প্রাণ-সংযম করিতে হইবে। প্রাণ-সংযম দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—কামের এই তিন দুর্গ জয় হয়। যখন প্রাণ-সংযম অভ্যাস হইতেছে, মন প্রাণ-সংযমে স্থির হইতেছে, তখন যোগারূঢ়-অবস্থা। যোগারূঢ় হইলে মনকে শম অভ্যাস করাইতে হইবে। যোগারূঢ় হইলেই একান্তে আত্মসংস্থ হইতে অভ্যাস করিতে হইবে।

১৯। যোগী নির্জ্জন পবিত্রস্থানে সর্ব্বদা স্থির-সুখ আসনে কায়গ্রীবাদি সমান রাখিয়া যুক্তাহার-বিহারী হইয়া আত্মসংস্থ হইতে অভ্যাস করিবেন। আত্মসংস্থের সাধনা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"সঙ্কল্প প্রভাবান্" ইত্যাদি। যদি কোন সুকৃতিশালী পুরুষ মনকে একবার চিন্তা-শূন্য করিয়াই আপনার দ্রষ্টাস্বরূপ অনুভব করিতে পারেন—আমি দ্রষ্টা, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় যাহা করে, তাহাতে আমার সুখদুঃখাদি নাই—প্রকৃতির কর্ম্মের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—এই দ্রষ্টা-স্বরূপে যদি কেহ স্থিতি লাভ করেন, তবে তাঁহার অন্য সাধনার

আবশ্যকতা নাই। কিন্তু প্রায় সাধকের ইহা হয় না—হয় না বলিয়াই দ্রষ্টা-স্বরূপে দৃঢ়তা জন্য ভক্তি আবশ্যক।

২০। তপস্বী, পরোক্ষজ্ঞানী এবং কর্ম্মী অপেক্ষা আত্মসংস্থ-যোগী শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে যোগী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঈশ্বর-ভজনা করেন, তাহাকেই যোগি-শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আত্মসংস্থভাবে দৃঢ়তা না হওয়া পর্য্যন্ত যোগীর মন বিষয়ে আসিতে পারে। দৃঢ় ভাবে আত্মসংস্থ হইলেই মন আর বিষয়ে আইসে না। উভয়েই যোগী। যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, গীতা ভজনকারীকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ততমো মতঃ॥

২১। আত্মসংস্থতা ও ভক্তি এই দুইটি নিষ্কামকর্ম্মযোগের প্রকার ভেদ মাত্র। এইগুলি আত্মজ্ঞান-লাভের নিকটবর্ত্তী উপায়। এতদ্ভিন্ন স্থূল ভাবে যে সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে "তুমি প্রসন্ন হও" এই শ্রীকৃষ্ণার্পণ করিবার চেষ্টামাত্র করা হয়। এইটুকু নিষ্কামকর্ম্মযোগের সর্ব্বনিম্ন অবস্থা। গীতায় শ্রীভগবান্ কর্ম্ম—অর্থে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম, উভয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। "যৎকরোষি যদশ্নাসি" এই শ্লোক ইহার প্রমাণ। কিন্তু বৈদিক-কর্ম্মই গীতার মুখ্য কর্ম্ম। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"। (ভূতানাং ভবধর্ম্মকাণাং স্থাবর-জঙ্গমানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবম্ উৎপত্তিম্ উদ্ভবং বৃদ্ধিং চ করোতি যঃ বিসর্গঃ দেবোদ্দেশেন ত্যাগঃ শাস্ত্রবিহিতঃ যাগদান হোমাত্মকঃ। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নংততঃপ্রজাঃ ইতি ক্রমেণ স ইহ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দেনোক্তঃ।) শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞদানতপস্যাদ্বারা মনুষ্য দেবতাদিগকে ভাবনা করেন, তাঁহারাও বৃষ্টি অন্নাদি দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাদির উৎপত্তির ও বৃদ্ধির কারণ হয়েন। মনুষ্যের যে সমস্ত বিসর্জ্জনদ্বারা জীবের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই কর্ম্ম। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্য মেবতৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্"॥

এই সমস্ত কর্ম্ম এবং অন্যবিধ লৌকিক-কর্ম্মও যখন "তুমি সন্তুষ্ট হও" স্মরণ করিতে করিতে সম্পাদন করিতে পারা যাইবে, তখনই উচ্চ উচ্চ সাধনায় অধিকার জন্মিবে।

২২। যাঁহারা ক্রম ধরিয়া সাধনা করিতে করিতে আত্মসংস্থ হইতে পারিতেছেন এবং ভক্তি-যোগে নিরন্তর ভগবদ্রস আস্বাদন দ্বারা আত্মসংস্থ-যোগে স্থিতি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সকল কর্ম্মই স্বভাবতঃ নিষ্কাম হইয়া যাইবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

এই সর্ব্ব কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ আত্মসংস্থ-যোগীর স্বাভাবিক। মুখের অভ্যাসে ইহা স্থায়ী হইতে পারে না—বিনা ভক্তিতে পরমপুরুষকে লাভ করা যায় না। গীতা বলিতেছেন—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" ৮।২২

কিন্তু তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে জানা এবং তাঁহার স্বরূপানুভূতি ও তৎস্বরূপে স্থিতি জ্ঞানযোগেই সম্ভব।

২৩। ভক্তি যোগে যে উপাসনা তাহারও প্রকার-ভেদ আছে। ভক্তি-সাধকের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অভেদ ভাবনায়, কেহ বা পৃথগ্ ভাবনায়, অন্য কেহ বহু-ভাবনায় তাঁহার উপাসনা করেন। "একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্" ৯।১৫। এইরূপ ভক্তি-যোগে উপাসনা করিতে করিতে বিশ্বরূপের জ্ঞান জন্মিবে। যখন সর্ব্ব-জীবে নারায়ণ-বোধ হইবে, তখনই উপাসনা শেষ হইল। যতই ভগবদ্-বিভূতিতে দৃষ্টি পড়িবে, ততই উপাসনা পরিপক্ব হইবে। যোগি-ভক্তের মধ্যে কেহ বা বিশ্বরূপের উপাসক, কেহ বা অব্যক্তের উপাসক। অব্যক্তের উপাসক আপন সামর্থ্যে ঈশ্বর লাভ করেন, আর বিশ্বরূপের উপাসক ভগবৎ-সাহায্যে জ্ঞান লাভ করেন। ইঁহারা ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ, অন্যে নহে। গীতা নিষ্কামকর্ম্মসাধকের সাধনার উপসংহারে বলিতেছেন—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎ পরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥

ভগবান্ আত্মাই ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চয় বোধ হইলেই মৃত্যুসংসারসাগর অতিক্রম করা যায়। ইহারই উপায় যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান। "মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তি সাধকাঃ" ইহাও ভগবানের উক্তি। যোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান ভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না।

২৪। যোগি-ভক্তের সাধন-ক্রম দেখাইয়া গীতা বলিতেছেন—

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

যদি আমাতে মন ও বুদ্ধি স্থির করিতে না পার—

"অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়"॥

বিশ্বরূপের ধ্যানাভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তবে—"মৎ কর্ম্ম পরমো ভব" অর্থাৎ আমাতে মন রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমারই কর্ম্ম কর। যদি ইহাও না পার, তবে—"কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ" অর্থাৎ আত্মসংস্থ-যোগ অভ্যাস কর। এই সমস্ত দ্বারা তোমার সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-ত্যাগ হইবে। সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-ত্যাগই কর্ম্ম-যোগের শেষ। এক স্থানে ঈশ্বরদর্শন ও সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন, ইহাই ভক্তিযোগের সিদ্ধাবস্থা। এই ভক্তিযোগের শেষফল জীব ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান। এই জন্যই গীতা অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী।

২৫। জীব ও ব্রহ্মের একতা-জ্ঞানই জীবন্মুক্তি। গীতা বিংশতিপ্রকার জ্ঞান-সাধনা দেখাইয়াছেন। ত্রয়োদশ-অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাও ১৮।৫১-৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক-মধ্যে যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে কর্ম্ম সঙ্কেতের উপসংহার করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি—

২৬। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আশ্রয় না করিলে কর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে না। বিনা কর্ম্মে শ্রুতবিষয়ের স্থায়ী অনুভব হইবে না। তাঁহার অনুভব বিনা ভজন হইবে না। বিনা ভক্তিতে "তুমি আমার কে" ইহার অনুভব হইতে পারে না। গুণাতীত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অনুভব হইতে পারে না। এই গুণাতীত-অবস্থা-লাভ জন্য রজঃ ও তমকে প্রতিহত করিতে হইবে এবং নিত্য-সত্ত্বস্থ হইতে হইবে। যোগ ও ভক্তি পথে নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারা ইহা সাধিত হয়। ইহার পরে অব্যভিচারিভক্তিযোগে গুণাতীত হইতে হইবে। এই অবস্থায় জ্ঞানলাভ হইবে। জ্ঞানেই জীবন্মুক্তি।

আরও সহজে গীতার ক্রম উল্লেখ করা যাইতেছে—নিষ্কাম-কর্ম্ম দ্বারা প্রথম কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, দ্বিতীয় অবস্থায় একান্তে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। এই অবস্থায় ক্রমে ক্রমে পরাভক্তি ও পরম জ্ঞান। জ্ঞানেই মুক্তি।

গীতার লক্ষ্য ও কর্ম্ম বলা হইল। কিন্তু এত কথা বলিয়াও যেন তৃপ্তি

নাই। কি জানি কি এক অপূর্ব্ব ভাব গীতা-মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা শত প্রকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেও যেন প্রকাশ করা যায় না। ভগবান্ সত্যই বলিয়াছেন—"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ"। এত সূক্ষ্ম এই হৃদয়, এত বিশাল এই ভগবদ্ হৃদয়, যে কিছুতেই যেন ইহা ধরা দেয় না। ধরা দেয়—অথচ যেন ধরা হইল না বলিয়া বোধ হয়। ভগবানের কৃপা না হইলে ভগবানকে ধরা যায়না।

গীতাতে যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান—সমস্ত সাধনার কথা থাকিলেও গীতাকে ভক্তি-গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর - ইহাই গীতার শেষ উপদেশ। ভগবান, জীব ও চিত্ত—এই তিন লইয়া জগৎ। জীব যখন সর্ব্বদা আপন চিত্তের দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, তখনই জীবন্মুক্ত হয়, তখনই আপন স্বরূপে অবস্থান করে, তখনই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হয়। জীব কোন কোন অবস্থায় আপন চিত্তের দ্রষ্টা থাকিতে পারে, ইহা অনুভব করা যায়। কিন্তু কাম-ক্রোধাদি রিপুর আক্রমণে, নিদ্রাক্ষুধাদির সম্মোহনে অভিভূত হইয়া দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। সেই জন্য জীব ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করুক। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতে করিতে ভগবানের সহিত এক হইতে পারিবে। প্রাণস্পন্দন-রোধ যোগের শেষ কথা। যোগ নিতান্ত কঠিন। সকল লোকে ইহা পারে না। মহাভারতে এবং যোগবাশিষ্ঠে প্রাণস্পন্দনরোধ কত দূর কঠিন, তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। সাংখ্যজ্ঞান নিতান্ত দুরূহ। 'আমি ব্রহ্ম' মুখে বলা সহজ, কিন্তু যখনই আমি বলি—আমি সচ্চিদানন্দ, তখনই দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে কতটুকু জ্ঞান আমার আছে, কতটুকু আনন্দ আমার সম্বল। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ এই জন্য গীতাতে ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। ভক্তি আশ্রয় করিয়া যোগ ও জ্ঞান সাধনা কর। জীব আপন চিত্তের দ্রষ্টারূপে থাকিতে পারে না বলিয়া সর্ব্বদা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করুক, প্রার্থনা করুক, তাঁহার সাহায্যে আত্মার বিচার করুক। তিনিই কৃপা করিয়া উদ্ধার করিবেন, ইহাই তাঁহার আশ্বাস-বাণী।

ষষ্ঠ কথা।

গীতার স্থান, কাল ও পাত্র।

স্থান, কাল ও পাত্র কাব্য সম্বন্ধেই আলোচিত হইয়া থাকে। গীতা কি কাব্য? যদিও গীতা ধর্ম্মগ্রন্থ, যদিও গীতা সর্ব্ব-উপনিষদের সার, যদিও গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, তথাপি ইহার প্রথম অধ্যায়ে কাব্যের সমৃদ্ধ উপাদান দৃষ্ট হয়। পুজনীয় গীতা-রহস্যকার বলেন—"কাব্যাংশে ভগবদ্গীতা ভূতলে অতুল। স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে এরূপ সমৃদ্ধ কাব্য আর কোথায়?"

প্রথমেই স্থান-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। গীতার উৎপত্তি-স্থান কুরুক্ষেত্রের মহাসমর-ক্ষেত্র। স্বচক্ষে দেখিয়া আইস - কি এক মহাশ্মশান এই কুরুক্ষেত্র! কি এক দুর্ব্বিষহ বিষাদগীতি এইস্থানে নিরন্তর গীত হইতেছে। আজিও এই কুরুক্ষেত্রের যেদিকে অবলোকন করিবে, সর্ব্বত্রই দেখিবে বিনাশ-চিহ্ন। প্রাচীন বৃক্ষ প্রাচীন কুণ্ডতড়াগাদির কথা ছাড়িয়া দাও, নূতন যাহা কিছু হইতেছে, তাহাও যেন অক্ষুণ্ন থাকে না। সমর-ক্ষেত্রে যে সমস্ত লতা-গুল্মাদি জন্মিয়াছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন রুধির হইতেই ইহারা উৎপন্ন। এই স্থানেই ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়শোণিতে পৃথিবীকে রুধিরাক্ত করিয়াছিলেন। যে শোণিতময় পঞ্চহ্রদে তিনি পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন এখনও সেই পঞ্চহ্রদ পুরাকালের ইতিহাস প্রচার করিতেছে। এখনও সমন্তপঞ্চকে কত লোক প্রতিবৎসর স্নানার্থে গমন করে। কাল-পুরুষ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আজ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে। সম্মুখে রণ-নদী—এই রণ-নদীর বর্ণনা সুন্দর!

ভীষ্ম-দ্রোণ-তটা জয়দ্রথ-জলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্য-গ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণ-নদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ॥

অত্যুচ্চ তটশালিনী সমরনদী দু'কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে। এই খর-স্রোতার জলে কোথাও প্রচণ্ড আবর্ত্ত; কোথাও ভয়ঙ্কর মকর কুম্ভীর, কোথাও

বা সুন্দর নীলোৎপল! ভীষ্ম দ্রোণ ইহার তটভূমি, জয়দ্রথ ইহার জলরাশি, দুর্য্যোধন প্রচণ্ড আবর্ত্ত, শল্য কুম্ভীর, কৃপ বহনী, কর্ণ বেলাভূমি, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ঘোর মকর। পাণ্ডবদিগকে এই রণ-নদীর পরপারে যাইতে হইবে। স্বয়ং কেশব ইহার কৈবর্ত্ত। সমষ্টি-ভাবে যে ভগবৎ-সাগরে এই রণ নদী মিশিয়াছে, বিশ্বরূপ দেখাইবার সময়ে যাহা ভগবান্ ভক্তকে দেখাইয়াছেন, সেই ভগবান্ ব্যষ্টিভাবে পাণ্ডব-তরণীর কর্ণধাররূপে আজ আপন জলে আপনি ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। জীবপুঞ্জকে তাড়িত করিয়া এই ভীষণ কুরুক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম—কুরুক্ষেত্রের মত ভীষণ সমর-ক্ষেত্র আর কোথায়?

তাহার পর গীতার কাল? প্রবল ঝটিকার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রকৃতি কত শান্ত, অনুভব কর? নারায়ণ বিনাশ-কামনায় সমবেত নরপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিতেছেন—আপন বিকৃত অঙ্গ আপনি ছেদন করিবেন, তাই আপনাকে আপনি অবলোকন করিতেছেন। এখনই রুধির-স্রোত প্রবাহিত হইবে, সমবেত জনসঙ্ঘ বিনষ্ট হইবে, পৃথিবীর পাপভার দূর হইবে, ভারতরমণীর হাহাকারে দিগন্ত প্র ত ধ্বনিত হইবে। এখনও কিন্তু সসৈন্য সমবেত রাজন্যমণ্ডলী স্থির, এখনও পরস্পর বিধ্বংসকারী দুই মহাসমুদ্র স্তম্ভিত— মহাসমুদ্রে একটিও তরঙ্গ ভঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে না। বিদ্যুদ্ বজ্র-পরিপূরিত দুই প্রলয় মেঘ পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেছে। গভীর গর্জ্জনে এখনও পরস্পর পরস্পরের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। এখনও বিদ্যুদ্-বজ্রাঘাতের সহিত দুঃসহ বারিবর্ষণ আরম্ভ হয় নাই। প্রতি বীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে। অচিরে এই সমরাগ্নি সমস্ত জীবপুঞ্জ দগ্ধ করিবে। অচিরেই সমরপ্রাঙ্গন রুধিরাপ্লুত হইবে। রুধিরাপ্লুত কুরুক্ষেত্র প্রলয়কালের অনল-গোলকবৎ পৃথিবী মত প্রতীয়মান হইবে। এই লোক-ক্ষয়কর মহাযুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গীতা উপদিষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা উপদেশ সম্ভব কি অসম্ভব, ইহার বিচার পুস্তক মধ্যে করা হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা পাত্রের বিষয় আলোচনা করিব। ইহার আলোচনা বিশেষ ভাবেই করা উচিত। কারণ গীতার কাব্যাংশ মনন করিতে পারিলে—ভগবান্ ও অর্জ্জুনের ব্যবহার হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত করিতে পারিলে, সহজেই লয়-বিক্ষেপের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়—সহজে চিত্তশুদ্ধি লাভ করা যায়।

আমরা প্রথমেই দেখি মন্যুময় মহারাজ দুর্য্যোধন রণসজ্জা করিয়া সসৈন্যে কুরুক্ষেত্র-মুখে সাজিয়া চলিলেন। সৈন্যসংখ্যা একাদশ-অক্ষৌহিণী।

জৈমিনি ভারতে অক্ষৌহিণীর একটি সহজ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। দশসহস্র হস্তীর প্রত্যেকটি রক্ষা জন্য একশত করিয়া রথ, প্রত্যেক রথ রক্ষা জন্য একশত করিয়া অশ্ব, প্রত্যেক অশ্ব রক্ষা জন্য একশত করিয়া পাদাতিক ইহাই অক্ষৌহিণীর স্থূল হিসাব। যে মণ্ডলাকার স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ পঞ্চ-যোজন অর্থাৎ বিশ ক্রোশ। উপস্থিত সময়ে যে স্থান টুকুকে কুরুক্ষেত্র বলে, সে স্থানে অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্কুলান হয় না সত্য, কিন্তু যাঁহারা মহাভারত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—পঞ্জাব প্রদেশের দূর দূরবর্ত্তী স্থান জুড়িয়া এই সৈন্য সামন্ত অবস্থান করিয়াছিল। আমরা গীতা পূর্ব্বাধ্যায়ে এই সমস্ত স্থান উল্লেখ করিয়াছি। আরও এক কথা—সমস্ত সৈন্য এককালে যুদ্ধ করে নাই, ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়ক আপন আপন সৈন্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমরাঙ্গনে আসিতেছিলেন, ইহাও মহাভারতে উল্লেখ আছে। যাহা হউক একাদশ-অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন, আর পাণ্ডবেরা উত্তর-পূর্ব্বদিকে সপ্ত-অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলেন। মনে মনে গীতার এই প্রথম দৃশ্য অঙ্কিত কর, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ কুরুক্ষেত্র প্রান্তর। এই বিশাল কুরুক্ষেত্রে অগণিত কুরুসৈন্য যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত, কোথাও আর স্থান নাই। দ্বাপর-যুগের প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গ এখানে পরিলক্ষিত হইতেছে, সঞ্জয় স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এবং দিব্য-চক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রকে তাহারই সংবাদ দিতেছিলেন, বলিতেছিলেন—রাজন্! ঐ দেখ, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াও মহামানী রাজা দুর্য্যোধন রাজবেশে পদব্রজে আচার্য্যের নিকট গমন করিতেছেন। দ্রুত গমনে নানারত্ন-বিজড়িত শির-তাজ রাজমস্তকে কম্পিত হইতেছে। আজ পাণ্ডব-সৈন্য দেখিয়া নিজ-মর্য্যাদা ভুলিয়াছেন, সেনাপতিকে না ডাকাইয়া নিজেই দৌড়িয়া যাইতেছেন। ঐ দেখ, রাজনীতি-কুশল মহারাজ নিজের ভীতি সঙ্গোপন করিয়া সংক্ষিপ্ত অথচ বহু-অর্থযুক্ত বাক্যে আচার্য্যকে অঙ্গুলি তুলিয়া পাণ্ডব-সৈন্য দেখা-ইতেছেন। বলিতেছেন, হে গুরো! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদ-পুত্র-বিরচিত পাণ্ডব-চমূ কিরূপে সজ্জীকৃত হইয়াছে। গুরুর ক্রোধোদ্রেক করাই দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য। (ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য হইয়াও গুরুর বধোপায় কৌশলে জানিয়া লইয়াছে। এক্ষণে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া বিনাশার্থ আসিয়াছে)। আরও দেখুন, এই সৈন্যমধ্যে শূর, বাণক্ষেপকুশল যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য মহারথ

যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, বীর্য্যবান্ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। শস্ত্র শাস্ত্র-প্রবীণ মহারথ একাকী দশসহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধে সমর্থ, এতদ্ভিন্ন শত শত অতিরথী, লক্ষ লক্ষ রথী ও অর্দ্ধরথ রহিয়াছে।

পাণ্ডব-সৈন্য দেখাইতে দেখাইতে দুর্য্যোধনের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষ ভিতরে অন্যায় আছে। রাজা অন্তর্ভীতি আচ্ছাদন করিয়া অপনাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তখন আপন পক্ষের প্রধান প্রধান সেনানায়ক দিগের নামোল্লেখ করিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার পক্ষেও আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূবিশ্রবাঃ এবং রাজা জয়দ্রথ আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য জীবনত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন; ইঁহারা সকলেই অস্ত্রধারী ও যুদ্ধ-বিশারদ। আমাদের সৈন্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং অপর্য্যাপ্ত। আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে ব্যূহ রচনা করিয়া ভীষ্মকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন। ভীষ্ম যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবেন, তখন যেন অন্যদিক্ হইতে কোন শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে।

দুর্য্যোধন নানা কথা কহিলেন, কিন্তু আচার্য্য কোন কথার উত্তর দিলেন না। দূর হইতে পিতামহ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, দুর্য্যোধনের মনের অবস্থা বুঝিলেন, ভীষ্ম বহুদর্শী ও প্রবীণ; ভীষ্ম পিতামহ—দ্রোণ-অপেক্ষা আত্ম-জন। ভয়ভীত দুর্য্যোধনের উৎসাহ জন্য তিনি শঙ্খধ্বনি করিলেন, তখন শত শত শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ, গোমুখ প্রভৃতি রণবাদ্য একেবারে বাজিয়া উঠিল, তুমুল শব্দে আকাশ ও রণভূমি পরিপূরিত হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া এই দৃশ্য স্মরণ কর।

একবার দু'টি চক্ষু উন্মীলন কর, আবার দেখ কি সুন্দর—দেখ শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথাসীন কৃষ্ণার্জ্জুন আপন আপন শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের শঙ্খ নিনাদিত হইল, দ্রুপদাদি নরপতিগণ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাদন করিলেন। অতিভৈরব সেই শঙ্খধ্বনি পৃথিবী ও আকাশ তুমুল করিয়া তুলিল, এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

ক্রমে রণবাদ্য মন্দীভূত হইল, আবার সেই অগণিত সৈন্য অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের ন্যায়, অনুত্তরঙ্গ জলরাশির ন্যায় গম্ভীর হইল, গীতার দ্বিতীয় দৃশ্যে

স্বতন্ত্র অভিনয় অনুভব কর। উৎকট শঙ্খনিনাদে কেহই রণে ভঙ্গ দিল না, বরং স্পর্দ্ধাসই দণ্ডায়মান রহিল। সমর-কেশরী অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ!

বারণাবতের ভীষণ কু-অভিসন্ধি, দ্যূতক্রীড়ার নৃশংস কপটাচার, দ্রৌপদী-বস্ত্রহরণের দারুণ অপমান, অজ্ঞাতবাসের বিজাতীয় ক্লেশ সেই ক্রোধাগ্নিতে ফুৎকার দিতেছে। অর্জ্জুন গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়াছেন—অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন, সহসা অন্য বাসনা জাগিল।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে॥

অর্জ্জুন সমরার্থে অবস্থিত রাজন্য-বর্গকে দেখিতে চাহিলেন, হৃষীকেশকে বলিলেন হে অচ্যুত! যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি যুদ্ধকামী, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী এই নরপতি সমূহকে নিরীক্ষণ করি, তাবৎকাল তুমি উভয়-সেনার মধ্যে রথ স্থাপন কর। শ্রীভগবান্ তাহাই করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রথ উভয়সেনার মধ্যস্থলে আনীত হইল। অর্জ্জুন দেখিতেছেন—আত্মীয়, স্বজন, পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর—সকলেই যুদ্ধার্থ সমবেত। সহসা মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল—ক্রোধ দূরে গেল, আসিল নির্ব্বেদ। এই অর্জ্জুন-চরিত্রে আমাদের প্রয়োজন। সত্যকথা, অর্জ্জুনের মত বাহুবল আমাদের নাই, অর্জ্জুনের মত শূরত্ব আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্জ্জুনের মত শাস্ত্র-মর্য্যাদা, অর্জ্জুনের মত গুরু-মর্য্যাদা, অর্জ্জুনের মত লোক মর্য্যাদা আর আমরা দেখিতে পাই না। তথাপি যখন দেখি, এই মহান্ চরিত্র প্রবল উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্যের নিষ্ঠুরতা অনুভব করিয়া আমাদের মত চিত্তের দুর্ব্বলতা দেখাইতেছেন, যখন দেখি কর্ত্তব্যের গুরুভারে নিষ্পেষিত হইয়া—শোক-মোহাচ্ছন্ন হইলে আমাদের যাহা হয়—অর্জ্জুনের তাহাই হইতেছে, তখন অর্জ্জুনকে আমাদের মত ভাবিয়া অর্জ্জুনের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে আমরা প্রস্তুত হই। বড় ব্যগ্র হইয়া শুনিতে চাই, অর্জ্জুন কি বলিতেছেন? অর্জ্জুন বলিতেছেন—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মমগাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্চৈব পরিদহ্যতে॥

বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! হে কেশব! এই সমস্ত স্বজনকে যুদ্ধ করিতে আসিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, শরীর কম্পিত হইতেছে, রোমহর্ষ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে এবং ত্বক্ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন বিঘূর্ণিত হইতেছে, নানাপ্রকার অমঙ্গল দেখিতেছি—অর্জ্জুনের বিষাদ-শান্তির জন্য ভগবান্ ব্রাহ্মীস্থিতি উপদেশ প্রদান করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর ব্রাহ্মীস্থিতি—অর্থে বলিতেছেন "ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ, সর্ব্বকর্ম্ম সংনস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ" অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপে অবস্থানের নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্ব্বাণ, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি একই কথা। ব্রাহ্মীস্থিতি ভিন্ন শোকের চির-নিবৃত্তি হইতে পারে না। অন্য অন্য উপায়ে শোক দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইতে পারে সত্য, কিন্তু ক্ষণিক-নিবৃত্তি জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ব্যাকুল নহেন। কারণ গুরুকর্ত্তব্যপালনে লঘুকর্ত্তব্যের সুখ অবশ্যই লাভ হয়। আত্যন্তিক নিবৃত্তিই একমাত্র প্রয়োজন। সাংখ্য-শাস্ত্রে এই আত্যন্তিক নিবৃত্তিই লক্ষ্য, যোগশাস্ত্রে এই আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান; বেদান্তে ইহারই জন্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। গীতা দ্বিতীয়-অধ্যায়ে ব্রাহ্মীস্থিতির স্বরূপ কি, বুঝাইয়াছেন এবং বাকী অধ্যায়গুলি এই স্থিতি কিরূপে লাভ হইবে, তজ্জন্য সাধনার ক্রম দেখাইয়াছেন। আমরা অতিসংক্ষেপে গীতোক্ত ব্রাহ্মীস্থিতি বা মুক্তির আলোচনা করিব। গীতার প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ যোগ, শেষ-অধ্যায়ে মোক্ষ যোগ।

যেখানে অর্জ্জুন দুঃখ করিতেছিলেন -আত্মীয়স্বজন মরিবে, সেইখানে ভগবান্ বলিতেছেন—"আত্মার মৃত্যু নাই"। এই সমস্ত ব্যক্তির "আত্মা" অজর অমর।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানেশরীরে॥

জীবের আত্মা শরীর নষ্ট হইলেও মরে না। এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। বালক যোদ্ধা প্রসিদ্ধ বীরপুরুষদিগের নিকট অস্ত্রপরীক্ষা দিতে গিয়া যেরূপ কম্পিত হয়, বালক বক্তা জগন্মান্য পণ্ডিতমণ্ডলী-মধ্যে প্রথম মুখ খুলিবার সময় যেরূপ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হয়, শুষ্ক-মুখে আপন হৃদয়ে যেরূপ গুরুতর ঘাত-প্রতিঘাত উপলব্ধি করে, অর্জ্জুনের ততোধিক হইতেছে, অথচ

অর্জ্জুন বিশ্ববিজয়ী মহাপুরুষ। কিরাতরূপী ভগবান্ পিনাকপাণি এই অর্জ্জুনের পরাক্রমে পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

ভো ভো ফাল্গুন তুষ্টোঽস্মি কর্ম্মণাঽপ্রতিমেন তে।
শৌর্য্যেণানেন ধৃত্যা চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে সমঃ॥

হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ম্মে বড়ই তুষ্ট হইলাম, ধৃতি ও শৌর্য্যে তোমার মত ক্ষত্রিয় আর নাই।

যখন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অব্যবহিতপূর্ব্বে এই অর্জ্জুন বিরাট-রাজকুমার উত্তরের সারথ্য করিয়াছিলেন, যখন উত্তর ভীত হইয়া ক্লীব বৃহন্নলার ভীতি উৎপাদন জন্য পুনঃ পুনঃ কৌরবসৈন্য দেখাইতেছিলেন, পুনঃ পুনঃ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্যাদি কুরুবীরগণের নামোল্লেখ করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন—তুমি একাকী, কিরূপে এই প্রবল পরাক্রান্ত মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন যে অর্জ্জুন সগর্ব্বে বিরাট-পুত্রকে উত্তর করিয়াছিলেন "উত্তর! যখন দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে লক্ষাধিক নরপতি আমায় আক্রমণ করিয়াছিল, তখন আমি একা—কে তখন আমার সহায় হইয়াছিল? যখন কালান্তক যমতুল্য অগণিত নিবাতকবচগণের সহিত আমি যুদ্ধ করিয়াছিলাম, কে তখন আমার সাহায্যার্থ আসিয়াছিল? যে অর্জ্জুন ঐ সময়ে উত্তরকে সারথি করিয়া বহুবার ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহারথকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনাদির প্রাণসংহারে সমর্থ হইয়াও যিনি সম্মোহন-অস্ত্রে কৌরব-শত্রুদিগকে মূর্চ্ছিত মাত্র করিয়াছিলেন, প্রাণসংহার করেন নাই, সেই অর্জ্জুন আজ বলিতেছেন—

"ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।"

হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন ঘূর্ণিত হইতেছে—বলিতেছেন—

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈ র্জীবিতেন বা॥"

কৃষ্ণ! আমি রাজ্যও চাহিনা, ভোগও চাহি না, জীবনেও আমার প্রয়োজন নাই। অর্জ্জুন মহাপুরুষ। মহাপুরুষও সাধারণের মত কাতরোক্তি করেন—সাধারণে আশান্বিত হয়, অর্জ্জুনকে আপনাদের মত মনে করে। তথাপি অর্জ্জুনের সহিত সাধারণের কোন বিশেষ সাদৃশ্য নাই। অর্জ্জুন মহাপুরুষ, তাহারা কাপুরুষ। জীবন-সংগ্রামে ভীত হইয়া লোকে শতবার বলে "আর পারি না", "মৃত্যু হইলেই ভাল হয়" অর্জ্জুন কিন্তু "পারি না" বলিতেছেন না,

বলিতেছেন "যুদ্ধ করিব না" কারণ যুদ্ধ করা নিষ্ঠুরের কার্য্য, আমি নিষ্ঠুর হইতে চাহি না। ক্লেশের ভয়ে বা প্রাণের ভয়ে কিন্তু অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না, হইতেছেন করুণায়—পাছে অপরের জীবন নষ্ট হয় এই জন্য—কিরূপে গুরুকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিবেন, কিরূপে পিতামহকে অস্ত্রাঘাত করিবেন, এই জন্য। ভীষ্ম ও দ্রোণের কথা অর্জ্জুন একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছেন। যে পিতামহের ক্রোড়দেশে উপবেশন করিয়া পিতৃহীন বালক পিতামহকে পিতা সম্বোধন করিত, আর ভীষ্ম সজলনয়নে বালকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন, আজ যাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে বিনাশ করিব কিরূপে? অর্জ্জুন এই জন্য শোকে কাতর। যে আচার্য্য অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রধান করিবার জন্য অশ্বত্থামাকেও গোপন করিয়া অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন—যে আচার্য্য অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ না থাকে, এই জন্য একলব্যের নিকটে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গুরুকে প্রাণে বিনাশ করিতে হইবে—অর্জ্জুন কৃপা-পরবশ হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। তুমি কি এই কৃপাবেশে আবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাক? তুমি কি মনে ভাব—এই ধন তুমি গ্রহণ করিবে না, কারণ তুমি গ্রহণ করিলে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীর মনঃপীড়া হইবে, অতএব গ্রহণ করা উচিত নহে—ইহা কি লোকের উক্তি? তাই বলিতেছিলাম কিছু পার্থক্য আছে। অর্জ্জুনের বিষাদ অস্বাভাবিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধুবিনাশ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এ বিষাদের মূলে পাপ নাই, আছে গুরু বা আচার্য্য বিনাশ-ভয়। যাহা হউক এই বিশ্ববিজয়ী মহাপুরুষ আজ যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করিয়া দীনভাবে দণ্ডায়মান, যাঁহার সব্যসাচিত্বে দেবাসুরে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাহস পাইত না, যিনি শৌর্য্যে সুরোন্মাদিনী উর্ব্বশীকেও তুচ্ছ করিয়াছিলেন, এই শূর এই বীর আজ অস্ত্রত্যাগে উদ্যত হইয়া আর অস্ত্রত্যাগ করিলেন না অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাতরে যোড়-করে দাঁড়াইয়াছেন, এই লোকক্ষয়কর সমর প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়াছে, যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আজ তিনি ভিক্ষাবৃত্তিগ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছেন, আর সর্ব্ব-লোক-মহেশ্বর, ভক্ত তরণীর কর্ণধার, দীনের বন্ধু, তাপিতের আশ্রয়, বিপন্নের মধুসূদন, এই কাতর জনের রথে সারথি।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি ভগবান? অবতারবাদ কত দূর সম্ভব? দিব্য চক্ষু কি হইতে পারে? অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কাহারও কি হইয়াছিল? জীবন্মুক্তি কি,

কথার কথা নহে ? অধিকাংশ লোকেরই এই সন্দেহ। সন্দেহ হওয়াই উচিত। কর্ম্মশূন্য জ্ঞান আলোচনায় যদি ইহা না হয়, তবে এই যুগাধিপতির দোষ পড়িবে। সংযম অভ্যাস না করিলে, যোগ-ধারণা করিতে না পারিলে, তপস্যা না করিলে—এক কথায় তন্ময়তা, একাগ্রতা এবং চিত্তশুদ্ধি আচরণ না করিলে, দিব্য চক্ষু, জীবন্মুক্তি, অবতার, অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব।

আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেই স্পষ্ট বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার কি না ? এখানেও অবতারসম্বন্ধে গীতার মত যাহা, আমরা তাহাইবলিব।

গীতার চরিত্র তিনটি (১) সঞ্জয় ২) অর্জ্জুন (৩) শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আপনাকে পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভগবান্, আত্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এখানে সঞ্জয় ও অর্জ্জুন যে নামে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন নামে মানুষ ভগবান্‌কে ডাকে না। সঞ্জয় বলিতেছেন, হৃষীকেশ (১।১৫,২০,২৪,২।৯,১০) মধুসূদন (২।১) ভগবান্ (সর্ব্বত্র) গোবিন্দ (২।৯) হরি (১১।৯,১৮।৭৪) কেশব (১১।৩৫,১৮।৭৬) কৃষ্ণ (১১।৩৫,১৮। ৭৫,৭৮) মাধব (১।১৪) যোগেশ্বর (১১।৯,১৮।৭৫,৭৮) বাসুদেব (১১।৫০,১৮।৭৪) আর অর্জ্জুন ? ইনি শ্রীকৃষ্ণের সখা, সখা হইয়াও বলিতেন অচ্যুত (১।২) কেশব (১।৩৩) মধুসূদন, গোবিন্দ, জনার্দ্দন (১।৩৫) মাধব, বার্ষ্ণেয় পুরুষোত্তম, পরব্রহ্ম (১১।১২। পরমধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, স্বপ্রকাশ, আদিদেব, অজ, সর্ব্বব্যাপক, বিভু, ভগবান্ (১০।১৪) ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতি (১০।১৫) ইত্যাদি। ভগবানের এই সমস্ত নামেই বিশ্বাস করিয়া লোকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে। ভগবান্ যে জ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যে তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা কোন মানুষের প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, যে বিশ্বরূপ তিনি ভক্তকে দেখাইতেন, তাহা কোন মানুষেই দেখাইতে পারে না, তিনি আপন মহিমা আপনি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—আমিই ভগবান্। তাঁহার ভক্ত তাঁহাকে শত নামে ডাকিতেছে, শত বার পরমাত্মা, বিভু, আত্মা বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি আছে ? যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা যাইবে। যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিতে পারিল না, ভগবান্ তাহাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়াও বলিতেছেন, তাহাদের গতি কি। ইহাতেও যদি লোকের বিশ্বাস না হয়, তবে তাহাদের যাহা অভিরুচি, তাঁহাই করুক, ইহাতে ভগবানেরই বা কি ক্ষতি, তাঁহার ভক্তেরই বা কি অনিষ্ট হইতে পারে ? অল্পবিশ্বাসী এই সমস্ত সংশয়ের

কথা শুনিয়া অল্প বিশ্বাস টুকুও পরিত্যাগ করিয়া অধঃপাতে না যায়, এই জন্য লোককে সাবধান করা স্বভাবসিদ্ধ। লোকে অবতার বিশ্বাস করিতে চায় না, কিন্তু আর্য্য-ঋষিগণ অবতার স্বীকার করিতেন। তাঁহারা সাধারণ মনুষ্যের সহিত অবতারের এই পার্থক্য দেখাইতেছেন যে, অবতার আত্মজ্ঞান লইয়া অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণ মনুষ্য অজ্ঞান লইয়াই জন্মে। অবতারের জন্ম ও কর্ম্ম কতক অংশে সাধারণ মনুষ্যের মত, কতক অংশে অলৌকিক। এই অলৌকিকত্ব আত্মজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব নহে। সিদ্ধ পুরুষের কার্য্যকলাপেও অনেক অলৌকিকত্ব দেখা যায়, আর ভগবানের কথা ত স্বতন্ত্র। অষ্টসিদ্ধি যাঁহার করায়ত্ত, যিনি যোগেশ্বর, তিনি ইচ্ছা করিলে না দেখাইতে পারেন কি? মনুষ্য নিয়মে বাধ্য, কিন্তু ভগবান্ কোন নিয়মে বদ্ধ নহেন। জড়ই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি স্বাধীন, তিনি নিয়মের অধীন কিরূপে হইবেন। তিনি আপন নিয়ম মতে জগৎ চালাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রয়োজন পড়িলে ভগবান্ও কি আপন নিয়ম আপনি অতিক্রম করিতে পারেন না? যিনি স্বাধীন, তাঁহার এ শক্তি থাকিবে না কেন? নতুবা স্বাধীনতার ত কোন অর্থ নাই। অবতারের কার্য্যেও ত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অগ্নি সকলকে দগ্ধ করে কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ভক্ত প্রহ্লাদকে দগ্ধ করে নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তির কার্য্য না হওয়া, প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত। কিন্তু ভগবানের ইহা অসম্ভব নহে। ভগবানের স্বাধীন ইচ্ছা। তিনি সর্ব্বকালে একরূপ আচরণ করেন কি না, তাহা কে বলিবে? তিনি কখন কখন মৎস্য, কখন কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইবেন—দুর্ব্বল অবিশ্বাসী অজ্ঞানান্ধ মানবের হৃদয় যাহা বিশ্বাস করিতে অসমর্থ, তাহাই যে অসম্ভব, তাহাই যে প্রক্ষিপ্ত বা কাল্পনিক, ইহা বলিবার অধিকার কাহারও নাই।

বলা হইতেছিল—যখন অর্জ্জুন শোকমোহে আচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন—জ্ঞাতিবিনাশ অপেক্ষা নিজের মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর ভাবিলেন, তখন সাধারণ মনুষ্য অর্জ্জুনের প্রশংসাই করিয়া থাকে, দোষ কিছুতেই দিতে পারে না। কিন্তু ভগবান্ অর্জ্জুনকে নিন্দা করিলেন, অর্জ্জুনকে দুর্ব্বল-হৃদয় বলিলেন অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মত্যাগী বলিলেন। এ ক্ষেত্রে লোকে ভগবানের নিন্দাই করিবে। ইহাই লোকের অজ্ঞান। পরমাত্মার সর্ব্বশক্তিমত্তা যাঁহারা স্বীকার করেন, সর্ব্বদর্শিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন—তাঁহারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জগতের

উপকারার্থ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে না পারিলেও সর্ব্ব-দ্রষ্টা ভগবান্ ইহা বুঝিয়াছিলেন, এককথা সকলকেই বলিতে হইবে। লোকের বিচারে যে কার্য্য নিষ্ঠুর, ভগবানের বিচারে তাহা নিষ্ঠুর না ও হইতে পারে। মানুষ দুই দশ জনের মঙ্গল গণনা করিতে পারে, কিন্তু যিনি ত্রিলোকের হিতাহিত বিচার করেন, তিনিই জানেন, মনুষ্যের পূর্ণ কর্ত্তব্য কি। জননীকে পুত্রহারা করা জনসাধারণের মতে নিষ্ঠুরের কার্য্য, কিন্তু ভগবান্ যদি ইহা নিষ্ঠুরের কার্য্য বিবেচনা করিতেন, তবে কি কোন জননী কখন পুত্রহারা হইত ? অর্জ্জুন মনে করিতেছিলেন—জ্ঞাতিবধ নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য, কিন্তু ভগবান্ দেখিতেছেন, আপাতনিষ্ঠুর কার্য্য দ্বারাও আত্মার উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। দেখিতেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জীবের মঙ্গলই সাধিত হইবে। যিনি মঙ্গলময়, প্রকৃত মঙ্গল তিনিই জানেন, এজন্য তাঁহার কোন কার্য্যে অমঙ্গল থাকিতে পারে না। তিনি দয়াময়, প্রকৃত দয়া কি, তাহা তিনিই জানেন, তাঁহার কোন কার্য্যে নির্দ্দয়তা থাকিতে পারে না। মানুষ অজ্ঞান, শরীরের অনিষ্ট হইলেই মনে করে কার্য্যটী অমঙ্গলময়, কিন্তু আত্মজ্ঞানী মঙ্গল অমঙ্গল বিচার করেন, আত্মার ঊর্দ্ধাধোগতি দেখিয়া। যে আত্মা যত দেহাভিমানী—যে আত্মা দেহে ও জগতে যত অহংজ্ঞান স্থাপন করিয়াছে—দেহাভিমান, সংসার-অভিমান, জগৎ অভিমান, যাহার যত অধিক, সেই তত অজ্ঞান -সেই তত শোক-মোহের দাস। শুধু অর্জ্জুনকে বিষাদগ্রস্ত দেখিয়া ভগবান্ যে তত্ত্বোপদেশ দিতেছেন, তাহাই নহে ; সর্ব্বশাস্ত্রেই বিষাদগ্রস্তের প্রতি আত্মানাত্ম-বিচার প্রথম উপদেশ। মোহগ্রস্ত যুধিষ্ঠিরকেও ভীষ্ম আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে বলিতেছেন। সাধারণ মনুষ্যের বিচারে বিষাদগ্রস্তের প্রতি আত্মতত্ত্ব উপদেশ “ধান ভানিতে মহীপালের গীত” বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ঋষিগণের বিচারে ইহাই এ অবস্থায় একমাত্র উপদেশের বিষয়। তুমি দুর্ব্বল হও বা সবল হও ; তোমার জন্য আদর্শ বিকৃত হইতে পারে না। ভগবান্ এইজন্য অর্জ্জুনকে সত্য তত্ত্ব জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাই পরোক্ষজ্ঞান। পরে যে উপায়দ্বারা তোমার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, তোমার অপরোক্ষানুভূতি হইবে—সেই কার্য্য ক্রম অনুসারে তোমাকে করান আবশ্যক। মৃত স্ত্রী বা মৃতপুত্র বা মৃত পিতামাতার দেহ অগ্নিসাৎ করা তোমার চক্ষে বর্ব্বরতা, কিন্তু যাঁহারা জানেন, কোন্ কার্য্যদ্বারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাঁহাদের চক্ষে ইহাতে নিষ্ঠুরতা কিছুই নাই, বরং একান্ত কর্ত্তব্য। শরীরের ক্লেশ কোন্ পদার্থ, কেন ইহা হয়, এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি দেহের নাশকে নাশ বলেন না। গীতা

এই তত্ত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা যথাস্থানে গীতার উপদেশ বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অর্জ্জুনের অজ্ঞানতা দেখিয়া যিনি নারায়ণ—তিনি বিপন্ন নরকে মোহমুক্ত করিতেছেন—পুরাতন শিক্ষার কাল-সঞ্চিত মোহান্ধকার দূর করিতেছেন—তাৎকালিক প্রাণশূন্য কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের আবর্জ্জনা দূর করিয়া জ্ঞান, উপাসনা ও কর্ম্মকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছেন—সাধ্য ও সাধনার উজ্জ্বল আলোকে দশদিক্ আলোকিত করিয়া নিত্য পরমানন্দ রাজ গুহ্য সনাতন রাজ্যের রমণীয় পথগুলি ক্রম অনুসারে উদ্ঘাটন করিতেছেন। বড় সুন্দর তাঁহার উপদেশ! বড় সুন্দর সেই উপদেষ্টার রূপ! সত্যই এই অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণে হর্ষ আইসে, আর এই অদ্ভুত রূপ চিন্তনে মুহুর্মুহুঃ আনন্দ লাভ হয়। রূপ সম্বন্ধে ব্যাসদেব বলিতেছেনঃ—

নীলনীরদপ্রভ দিব্যাভরণভূষিত তেজঃপুঞ্জকলেবর—পরিধান পীতাম্বর। মাধব হেম-মণ্ডিত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন! বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি ধারণ করিয়াছেন—যেন উদয়োন্মুখ সূর্য্যমণ্ডলে লাঞ্ছিত উদয়াচল। ত্রৈলোক্যমধ্যে এ রূপের তুলনা হয় না, আর তাঁহার গুণ? ভক্তমুখে গুণ শুনাই ভাল। রথী, সারথির রূপে গুণে উদ্ভাসিত; এস, ভক্তিভরে সারথি ও রথীকে প্রণাম করি, তুমিও কর।

গীতাপরিচয় শেষ হইল। সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ জন্য ভগবানের অবতার। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মসংস্থাপনও ভগবানের কার্য্য। ভগবল্লীলায় আমরা প্রথম দুইটি কার্য্য দেখি, শেষটি লইয়াই গীতা। গীতাদ্বারা জগতের ধর্ম্মসংস্থাপন হইয়াছে। জগৎ ও গীতা-স্থাপিত ধর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

গীতার ধর্ম্ম নূতন নহে। ইহা সনাতন ধর্ম্ম। গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা মহাভারতের উক্তি এ স্থলে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিলাম। যাঁহারা বলেন, গীতা মহাভারতের অনেক পরে রচিত হইয়া মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের মতটি ভ্রান্ত—আমরা মহাভারত হইতে ইহাই দেখাইতেছি।

গীতোক্ত ধর্ম্মের নাম ঐকান্তিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম নূতন নহে। বহুবার এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, আরও কতবার প্রচারিত হইবে, কে বলিবে? ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। মানবহৃদয়ের কলঙ্কচ্ছায়ায় এই ধর্ম্মমুকুর কালে কালে কলঙ্কিত হয় মাত্র। ইহা মানব হৃদয়ের দোষ, ধর্ম্মের দোষ নহে। ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া আবার এই সনাতন ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যান।

মহাভারত বলিতেছেন—বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে, মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যে ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে তাহা আপনার নিকট কহিয়াছি। এই ধর্ম্ম অতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদ-সম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋষিগণ-সমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ব্রহ্মা নারায়ণের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে ছয় বার উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং এই ছয়বার এই সনাতন ব্রহ্মবিদ্যা নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত হয়েন। প্রতিপ্রলয়ে এই বিদ্যা নারায়ণে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সপ্তমবারে নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ ব্রহ্মার নিকট এই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠদৌহিত্র আদিত্যকে, আদিত্য বিবস্বান্‌কে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুকে, মনু লোকপ্রতিষ্ঠা জন্য স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম্ম সমর্পণ করেন। ইক্ষ্বাকু ত্রিলোক মধ্যে উহা প্রচার করেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয়ে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে। পূর্ব্বে হরিগীতায় যতিধর্ম্ম কীর্ত্তন সময়ে মহারাজ! আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট ঐ ঐকান্তিকধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি।

'এই সনাতন ধর্ম্ম সকলের আদি, দুর্জ্জেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। (শান্তিপর্ব্ব ৩৪৯ অধ্যায়, কালীসিংহের অনুবাদ)

মনুষ্য আপন বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা জগতকে কখন উন্নত করিতে পারে নাই পারিবেও না। এই সনাতন-ধর্ম্ম-প্রভাবেই জীবের নিঃশ্রেয়স ও জগতের অভ্যুদয় হইবে, অন্ততঃ শাস্ত্রে ইহা দেখা যায়। ভগবান্ ব্যাস বলিতেছেন—"এই পাপ জগৎ ঐকান্তিকধর্ম্মাবলম্বী লোকসমুদায়ে পরিবৃত হইলে, হিংসা-পরিশূন্য, সর্ব্বভূত-হিতৈষী, তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা সত্যযুগ আবির্ভূত হইবে, এবং সমুদায় লোক নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের সন্নিধানে, ঋষিগণের নিকটে এইরূপে ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এস্থানে আমাদের একটু ক্রটি স্বীকার করিতে হইতেছে।

গীতার প্রতি শ্লোকের প্রতি শব্দের অর্থ জন্য মহাপুরুষদিগের ভাষ্য, টীকা ইত্যাদির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। শঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরির ভাষ্যবিবেচন, মধুসূদনসরস্বতীকৃত গূঢ়ার্থ-দীপিকা, নীলকণ্ঠসূরিকৃত গীতার্থপ্রকাশ, হনুমদ্ভাষ্য, রামানুজভাষ্য, বলদেবভাষ্য, বিশ্বনাথ কৃত টীকা, শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা প্রভৃতি হইতে সংস্কৃত প্রতিশব্দ গুলি গৃহীত। এই সমস্ত মহাত্মার সৎশাস্ত্র-সম্মত মন্তব্যগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ে দেওয়া হইয়াছে। অন্যশাস্ত্রগত বিরোধী মতগুলির সমন্বয়েও প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। বঙ্গভাষায় যাঁহারা গীতা সম্বন্ধে সৎশাস্ত্রমত যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও দেখা হইয়াছে। শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শশধর তর্কচূড়ামণি, নীলকণ্ঠ মজুমদার, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, আর্য্যমিশনের গীতা, ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের গীতা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়, গৌরগোবিন্দ সমন্বয় ইত্যাদি পুস্তক হইতেও শিক্ষার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া যেখান হইতে যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা অসম্ভব দাঁড়াইয়াছে।

গীতা বুঝিতে চেষ্টাই লক্ষ্য, এ জন্য যিনি মূলে লক্ষ্য রাখিয়া সৎশাস্ত্র অবিরোধী যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কথায় কথায় সমস্ত গৃহীতাংশ স্বীকার করা হয় নাই বলিয়া ক্রটি স্বীকার করা হইল।

আর এক কথা—নিজের জন্য এই অনুষ্ঠান হইলেও কেন ইহা প্রকাশ করা হইল? এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। পুস্তক প্রকাশ নামের জন্য নহে। প্রকাশের প্রধান কারণ—একটু ভিক্ষা। 'ভগবান্ প্রসন্ন হও' এই লক্ষ্যে কর্ম্ম করাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে, ভগবানের প্রসন্নতা ও ভক্তের প্রসন্নতা প্রায় তুল্য—যদি কোন সাধু মহাত্মা গীতা বুঝিবার প্রয়াস দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন—পূর্ব্ব বিস্মৃত ভাব স্মৃতিপথে উদয় জন্য গ্রন্থকারের প্রতি ক্ষণকালের জন্য কৃপাকটাক্ষপাত করেন, মনে মনে যদি ক্ষণকালের জন্য একবার স্মরণ করেন, তবে গ্রন্থকার—যদি মোহমায়ায় ভগবানকে ভুলিয়াও থাকেন—তখন সাধু মহাত্মার স্মরণ মাত্রে তাহার হৃদয়ে ভগবদ্ভাব জাগরূক হইবেই। সাধু কৃপায় ভগবৎ কৃপা লাভ হইবে। ভগবৎকৃপাদৃষ্টিই প্রার্থনা।